

এই লেখকের বহুল প্রশংসিত
আর একটি উপন্যাস
বিচিত্র দুনিয়া

TRISHNA
By
ANACHA

তৃষ্ণ

অ না চ

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র—১৩৫৭

প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
জীবেন্দ্র কুমার সেন

অলঙ্কার :
বিন্দুপাল

মুদ্রণ :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সমাজের হয়েও
যারা সমাজের কেউ নয়
তাদেরই উদ্দেশ্যে—

এক

শান্তনু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ডক্টর অব সায়েনস্‌'এর মানপত্রটা রাজ্যপালের হাত থেকে নিয়ে, আবার মাথা নীচু করে এসে নিজের জায়গায় বসল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেবার স্থান এই এ্যাম্‌ফি-থিয়েটার তখন ছাত্রছাত্রীতে বোঝাই। ভাবগম্ভীর পরিবেশ। শান্তনু ফিরে এসে তার জায়গাতে বসার সময় এ্যাম্‌ফি-থিয়েটারের মধ্যে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর হাততালি ঠিক তার কানে গিয়েছিল কিনা বোঝা মুশ্‌কিল।

কন্‌গ্রেচুলেসন শান্তনু। রাজা গোপালনের কণ্ঠস্বরেও শান্তনুর কোন ভাবান্তর হল না।

কি, ডক্‌টরেট হয়ে কি তোমার আরেকটা মাথা গজিয়েছে নাকি? প্রফেসরসিপ পেতে এখনও অনেক দেরী, বুঝলে? এখনও সাধারণ স্ট্যাটাসেই আছ। শান্তনুর গায়ে একটু ঝাঁকানি দেয় অর্দ্ধেন্দু।

ওঃ, আই এ্যম্‌ সরি। শান্তনু রাজা গোপালনের দিকে ফিরে তাকায়।

থ্যাঙ্‌ক্‌স। আই এ্যম রিয়েলী এ্যবসেণ্ট মাইনডেড্‌।

নেভার মাইণ্ড, আই নো ইওর নেচার। ইউ ওএ্যর লুকিং এ্যট হার।

'হু?' শান্তনুর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

বুঝেছি; আর বোঝাতে হবে না। অর্দ্ধেন্দু বাধা দেয়। অত খুঁজতে হবে না। সী ইজ সিটিং থ্রী রোজ বিহাইণ্ড আস।

অর্দ্ধেন্দু ও রাজাগোপালন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে শান্তনুকে কোন ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ না দিয়ে, এ্যাম্‌ফি-থিয়েটারের ডায়াসে তখন কি হচ্ছে সে দিকে মনোনিবেশ করল।

মাইকে তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মাধব শাস্ত্রীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে— পিতৃদেব ভব, মাতৃদেব ভব, অতিথি দেব ভব। ইতি আদেশ, ইতি উপদেশ ইতি……

এই স্লটার-হাউসে আর কতক্ষণ থাকতে হবে বাবা। অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। রাজাগোপালন সঙ্গদোষে এই কয় বছরেই বাংলাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। ওর দুঃখ শান্তনু ও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছে করেই তামিলটা শিখল না।

বোধহয় অভিমান করেই, ওদেরকে তার বাংলার উপর দখলটা একটু ভালকরে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলল—যতক্ষণ না এক এক করে সব নিধন-যজ্ঞ সমাপ্ত হচ্ছে।

অর্দ্ধেন্দু বিরক্তির সুরে বলে—এর চাইতে কলেজে কলেজে ডিগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া অনেক ভাল। প্রসেশন্‌ করে ভেড়ার পালের মত স্লটার হাউসে না আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তা তুমি এই ভেড়ার পালের সাথে মিশতে এলে কোন্‌ দুঃখে?

কি করব। এটা যে ইনস্‌টিংকৃট। তোমরা এলে, তোমাদের অনুসরণ করলাম। আমি তো আসি নি, আমরা এসেছি।

দেখ অর্দ্ধেন্দু, নিজেকে ভেড়া বানিয়েছ তাতে আপত্তি নেই। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন বাবা। রাজাগোপালন কৃত্রিম ক্রোধের সুরে গলাটা একটু পাল্‌টিয়ে দেয়।

অর্দ্ধেন্দুও সাথে সাথে বলে—ভেড়ার চাইতে অধঃস্তন কোন প্রাণীর কথা ঠিক মনে পড়ছে না। এ্যপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডের অভাবে তোমার মত শিক্ষিত প্রাণীর আপত্তি অবশ্যই করা উচিত। তবে কি জান—আমাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ঠিক ঠিক শব্দটি খুঁজে পেলে

সেটা আমাদের ভেড়ার প্রাপ্য সম্মানের চাইতে উঁচুদরের কোন বিশেষণের খোরাক যোগাত কিনা সন্দেহ। থ্যাঙ্কস গড। ওরকম কোন শব্দ খুঁজে পেলে, অভিধানে ভেড়ার চাইতে নিম্ন-স্থানাধিকারী কোন প্রণীর প্রবেশাধিকার হয়ে যেত।

রাজাগোপলন একটু বিস্মিত হয়ে বলে—তার মানে।

তার মানে খুব সোজা। ভেড়াদের স্লটার হাউসেই জীবন শেষ। আমাদের স্লটার হাউসে জীবন স্থরু। পশুশ্রেষ্ঠ মনুষ্য। আবার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হল, স্নাতক। স্নাতকের পর স্নাতকোত্তর, তারপর পি. এইচ. ডি. ও ডি. এস. সি যেই ছাপটা আজ শান্তনু পেল। কর্পোরেশনের ছাপের মত। স্লটার হাউসে গ্রেডেসনও হয়ে গেল। মারার পূর্বে ভেড়াকে ঘাস খাওয়ান আর কি। এর পর স্থরু হবে তিলে তিলে মরণ যজ্ঞ।

রাজাগোপালন একটু বিরক্তির সাথে বলে—তোমার অত হেঁয়ালী বুঝি না। অব কোর্স, ইউ আর ট্রায়িং টু মীন সামথীং।

অর্দ্ধেন্দু একটু দৃঢ় গলায় বলে—ইট ইজ ভেরি ইজি। আমি একটা অতি সত্যি কথাই বলছি। শান্তনু প্রফেসর না হওয়া পর্যন্ত তিলে তিলেই মরবে। তুমিও চাকুরী না পাওয়া অবধি বিষখাওয়াই শ্রেয় মনে করবে। তোমার ওই বড় বড় বুলিগুলো আর থাকবে না। চাকুরী না পেলে কুলিগিরি করে খাব। স্লটার হাউসের স্টাম্প পেয়ে গিয়েছ বাবা। চারটিখানেক কথা নয়। একেবারে জিওফিজিক্সে এম. এস. সি।

প্লীজ, একটু আস্তে।

পেছনের রো থেকে ভেসে আসা মেয়েলী কণ্ঠস্বরে অর্দ্ধেন্দু ও রাজাগোপালন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বোধহয় একটু বিস্মিতও, সেইসাথে ক্রুদ্ধ। দু-জনেই একটু আহত দৃষ্টি নিয়ে পিছনের দিকে ফিরে তাকায়। কে বলেছে বুঝতে পারলে স্লাইট এপোলজি চেয়ে নিত। কিন্তু পেছনের পর পর কয়েকটা রোয়েতে স্নো-পাউডার,

কস্‌মেটিক্‌স আর খোঁপার সাজে গড়া কতগুলো আইডিনটিক্যাল কেসের মধ্য থেকে কোন পারটিকুলার ভয়েসের উৎপত্তি স্থলটা কোথায় খুঁজে বের করা, অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালন কেন, শান্তনুর মত ডি. এস. সির পক্ষেও অসাধ্য। অর্দ্ধেন্দু ও রাজাগোপালন বিফল মনোরথ হয়ে দুজনেই একসাথে শান্তনুর দুদিকের কাঁধে দুটো হাত ফেলে বলে ওঠে—কি শান্তনু এত চুপ-চাপ যে?

শান্তনু অর্দ্ধেন্দু ও রাজাগোপালনের মাঝের চেয়ারটায় বসে ছিল। পেছনের রো'কে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল, তারা যে-সে লোক নয়। এই কনভোকেসনের একমাত্র ডি. এস. সি শান্তনু গুপ্তর ইয়ারের বন্ধু।

অবশ্য দুজনেরই এক সাথে একই সময়ে শান্তনুর কাঁধে হাত ফেলে একই প্রশ্ন করে ফেলাটা, একটা মিরাকিউলাস্‌ কোয়েনসিডেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। যদিও এরও একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে ওদের দুজনেরই আই. কিউ. এক. দুজনেই বেকার, এবং এম. এস. সি।

তোমরা দু-জনেই ভারি ডিস্‌টার্ব কর। কোনখানে গিয়ে একটু ধৈর্য ধরে কিছু শুনবে না। শান্তনু একটু বিরক্ত হয়।

মাইকে তখন ভাইস-চ্যান্‌সেলারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শেষ বক্তৃতা।

দীজ য়্যুনিভার্সিটি হ্যাজ নেভার সীন স্যাচ এ ট্যালেন্ট ইন দি পাস্‌ট। টু অনার প্রফেসর শান্তনু গুপ্ত ইজ টু অনার দি য়্যুনিভার্সিটি ইট্‌সেলফ্‌।

ভেরি ডিস্‌টারবিং। তখন থেকে কথা বলছে। নন্দী-ভৃঙ্গীর সাথে এখন মহাদেবও যোগ দিয়েছেন। আবার পেছনের সারি থেকে মেয়েলী কণ্ঠস্বর। এবার অবশ্য অর্দ্ধেন্দু বা রাজা-গোপালনকে উদ্দেশ্য করে নয়। নিজেদের মধ্যেই আলোচনা।

কথাটা শান্তনুর কানেও গিয়েছিল। ঘাড় ফিরে পেছনে

াকাতে বাধ্য হয়। কে বলেছে দেখতে নয়। তাদের মধ্যে ওর কান ছাত্রী আছে কিনা দেখবে। দেখতে পেল না। কারণ াজাগোপালনদের মত কাউকেই চিনতে পারলো না। বিরক্ত হয়ে াড়টা ফিরিয়ে নেয়। ও দেখেছিল, সব-কটা মেয়েই স্থানুর পুতুলের ত গভীর মনোযোগ সহকারে ডায়াসের দিকে তাকিয়ে আছে। াড়টা ফিরিয়ে আনার সময় এ্যাকসিডেন্টলি শান্তনুর দৃষ্টি পেছনের তীয় সারির কোণের চেয়ারটায় গিয়ে পড়ে। ঐ একটি দৃষ্টিই য়াসের দিকে ছিল না। চোখে চোখে পড়তেই মেয়েটি তার ষ্টি ঝট্ করে ডায়াসের দিকে ফিরিয়ে নেয়।

শান্তনু ঘাড় ফিরিয়ে আবার ভাল করে দেখে নিতে সাহস ায় নি।

দোষীকে শান্তনু খুঁজে পায় নি। কিন্তু একজন নির্দোষকে ান্তত পেয়েছে। নায়না এলিজাবেথ যে অমন কথা বলতে পারে া, সে কথা শান্তনু হলপ্ করে বলতে পারে।

দুই

বাড়ী ফেরার পথে অর্দ্ধেন্দু ও রাজাগোপালন পেছনের সারির মেয়েগুলো সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিল। শান্তনু সব শুনেছিল। কিছু বলে নি।

শান্তনুকে ওদের থেকে একেবারে আলাদাভাবে থাকতে দেখে অর্দ্ধেন্দুর কেমন একটু সন্দেহ হয়েছিল। অবশ্য শান্তনুর স্বভাবটাই ওরকম। এম. এস. সি. পড়ার সময় থেকে ওকে দেখে আসছে বেশ বাড়তি বয়সে এম. এস. সি. পড়তে এসেছিল শান্তনু।

কেন? এ প্রশ্ন করে কোনদিনই সদুত্তর পায় নি। তার মস্ত বড় একটা কারণ শান্তনু কথা বলে কম। এলাহাবাদে মাসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। বাবা, মা, ভাই-বোন কারুর কথা কোন দিন বলতে শোনে নি অর্দ্ধেন্দু। ইদানিং কালে শকুন্তলার কথা ওর মুখে খুব শুনেছে। একটু অবাকও হয়েছে। রাজাগোপালন সেদিন একটু ঠাট্টা করেই বলেছিল—

দেখলে অর্দ্ধেন্দু, তোমরা বহু চেষ্টা করেও শান্তনুর একটা ব্যবস্থা করতে পারলে না। আমি জানতাম শকুন্তলাকে দেখলে ও প্যাঁচে পড়বেই। দেখা যাক, শকুন্তলা ওর একটা হিল্লে করতে পারে কিনা?

আজকের কনভোকেসনে শকুন্তলাও এসেছিল। ওদের তিন সারি পেছনে ঠিক মাঝখানের একটা চেয়ারে বসেছিল। রাজাগোপালনই অর্দ্ধেন্দুর গায়ে ছোট একটা চিমটি কেটে দেখিয়েছিল বলেছিল, ডোণ্ট লুক স্ট্রেট এ্যাট হার। লেট্ হার ট্র্যাপ শান্তনু, নট ইউ।

অর্দ্ধেন্দু অবাক হয়ে বলেছিল—রিয়েলী, এ প্যারাগন অব

বিউটি। তোমাদের সাউথ ইণ্ডিয়ায় এ রকম কত মাল আছে বাবা। দাও না আমায় একটা যোগাড় করে। প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রাজগোপালন একটু বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আমি তো মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করি না। উপযুক্ত পাত্র পেলে জুটিয়ে দি। এক প্রকার ঘট্‌কালি করি। কোন ফিজও লাগে না। পাত্রপাত্রী পরস্পরকে পছন্দ করলেই আমি আমার পুরস্কার পেয়ে যাই।

অর্দ্ধেন্দু বলেছিল—তাই দাও, একটা পাত্রীই জুটিয়ে দাও।

রাজগোপালন একটু পরিহাসছলে বলেছিল—তাই নাকি? তা একটা পাত্রী দিতে পারি বৈকি। তবে শকুন্তলার মত নয়। ওর মত পাত্রীর জন্য শান্তনুর মত পাত্র দরকার—একে রিডার তায় ডি. এস. সি।

একটু থেমে ভ্রূটা কুঁচকে বলেছিল—তোমায় একটা দিতে পারি বটে—নিখুঁত সুন্দরী শুধু একটা হাত নেই। অর্দ্ধেন্দুর সম্মতির অপেক্ষায় রাজাগোপালন মুখের দিকে তাকায়—

ওরে বাবা, দরকার নেই আমার হাত কাটা মেয়ের।

রাজাগোপালনও চট্ করে বলে—কেন, তোমারও তো একটা পা নেই—তুমি বেকার খেয়াল আছে?

অর্দ্ধেন্দু আর এগায় নি, ডোন্‌ট কাট সিলি যোকস্।

অর্দ্ধেন্দুর ধারণা শান্তনু নিশ্চয় শকুন্তলাকে দেখেছে। মানপত্রটা নিয়ে ফিরবার পথে ও একটু বেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ভীড়ের মধ্যে ওর চোখ দুটো কাউকে খুঁজছিল। অবশ্য অর্দ্ধেন্দুর মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকলে কেউ সেটা টের পাবে না। মনে করবে কি উদাসীন দৃষ্টি। রাজাগোপালন আর অর্দ্ধেন্দু আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিল শকুন্তলার কনভোকেসনে আসার খবরটা শান্তনুকে দেবে না।

শান্ত শান্তনুর মনের অশান্ত রূপটা ওদের একটু দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।

মিস্ শকুন্তলার নামে একটা কমপ্লিমেনটারি কার্ড শান্তনু নিজের হাতে লিখে রাজাগোপালনকে দিয়ে বলেছিল, প্লীজ টেল হার টু এ্যাটেণ্ড দি কনভোকেসন।

রাজাগোপালন বলেছিল—ওঃ, সিওর।

অর্দ্ধেন্দু জানত শান্তনু একবার তার চেয়ারে এসে বসলে কিছুতেই পেছন দিকে ফিরে তাকাবে না। শকুন্তলার কথা কাউকে জিজ্ঞেসও করবে না।

তাই ওরা দুজনে ইচ্ছে করেই একটু বেশী কথা বলে শান্তনুকে পিছনে ফিরে তাকাবার স্কোপটা করেদিয়েছিল। অর্দ্ধেন্দু বুঝতে পেরেছিল ওষুধে কাজ হয়েছে। শান্তনু যে কাউকে দেখতে পেয়েছিল, সেটা সে টের পেয়েছে। তবে শান্তনুর মধ্যে যে রি-এ্যাকসন দেখবে ভেবেছিল, তা না দেখায় একটু যে চিন্তিত হয়েছিল সে কথা অর্দ্ধেন্দুর অস্বীকার করার উপায় নেই।

শান্তনুর এরকম পিকিউলিয়ার রি-এ্যাকসনের কারণটা না জানা পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুর শান্তি হবে না।

এতক্ষণ শকুন্তলার কথা চেপেই রেখেছিল। শান্তনুর বাড়ীর দরজায় এসে অর্দ্ধেন্দু আর স্থির থাকতে পারে না।

আচ্ছা শান্তনু, তোমার মত এমন আন সোসেল লোক তো দেখি নি।

কেন?

অর্দ্ধেন্দু কৃত্রিম ক্রোধের ভান করে বলে—কেন তুমি জান না? মিস্ শকুন্তলাকে নিজে নিমন্ত্রণ করে অমন অপমান করলে কেন?

অপমান! তুমি কি বলছ অর্দ্ধেন্দু? কোথায় অপমান করলাম!

কোথায় আবার, এ্যাম্ফিথিয়েটারে।

এ্যাম্ফিথিয়েটারে? মিস্ শকুন্তলা কি কন্ভোকেসনে এসেছিলেন।

খুব সাধু সাজছো দেখি ? তুমি দেখ নি ?

সী ওয়াজ সিটিং থ্রী রো'জ বিহাইণ্ড আস।

'থ্রী রোজ বিহাইণ্ড আস ? না দেখিনি।"

না দেখনি ? তাহলে পেছনে ফিরে কাকে দেখে তোমার ও রকম রি-এ্যাকসন হয়েছিল ?

কখন ?

কখন আবার, পেছনের মেয়েগুলো যখন আমাদের গালাগাল করছিল।

এবার শান্তনু হেসেই ফেলে—ওঃ তাই বল। আমার একটা ছাত্রীকে দেখে ভয়ানক রাগ হয়েছিল।

তাহলে তুমি শকুন্তলাকে দেখ নি।

"না, বিলিভ মি। আমি দেখিনি! আর তাছাড়া এটা রাজা-গোপালনের কাজ ছিল। ও এসে থাকলে আমায় বলা উচিত ছিল।

রাজাগোপালনের দিকে ফিরে একটু মুচ্‌কি হেসে শান্তনু বলে—ক্যান ইউ ডিনাই ইট ?

রাজাগোপালন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে তা করতে পারল না। ওর মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল—নো।

যাক, যা হবার হয়েছে। তুমি ওকে ব'লো রাজাগোপালন, আমি খুব দুঃখিত। ওর সাথে দেখা করতে পারি নি বলে। আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও।"

শান্তনুকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে অর্দ্ধেন্দু আর রাজা-গোপালন গিয়ে যমুনার পাড়ে পার্কটায় বসল। এলাহাবাদে আসার পর থেকে এইটাই তাদের একমাত্র আড্ডা দেবার জায়গা।

তারা যমুনার পাড় দিয়ে হেঁটে অনেকটা দূরে সরস্বতী কুণ্ডের

কাছে গেল। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার প্রতি তাদের দুইজনেরই আকর্ষণটা খুব বেশী। এই ব্যাপারটা একদিন রাজাগোপালনই ফাঁস করে দিয়েছিল।

বলেছিল—লুক্, হাউ স্ট্রেঞ্জ, উই হ্যাভ গট এ স্ট্রং এফিনিটি ফর দিজ আণ্ডার কারেন্ট। অর্দ্ধেন্দুও সাথে সাথে বলেছিল—ওঃ সিওর—আওয়ার নেচার ওয়ান্টস ইট।

হোয়াই?

উই হ্যাভ টু সারচ্ ফর দি কজ।

দেখ রাজাগোপালন বহুদিন তুমি আমায় এ প্রশ্ন করেছ। আজ তোমায় একটা সদুত্তর দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে।

অর্দ্ধেন্দু একটু চুপ করে থেকে বলে—জান আমাদের এই আণ্ডার কারেন্টের প্রতি এত এফিনিটি কেন?

রাজাগোপালন কৌতূহল বশে জিজ্ঞেস করে-কেন?

আমাদের প্রত্যেকের মনেই এরকম একটা আণ্ডার কারেন্ট আছে। সেটা যে কি আমরাও জানি না। না বুঝতে পেরে মাঝে মাঝে ভুলে যাই ওটার অস্তিত্বটা। আবার যখন ওটা প্রবল হয়ে ওঠে তখন ওটার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠি।

রাজাগোপালন বুঝতে পারে না অর্দ্ধেন্দুর কথা। বলে, কি রকম?

অর্দ্ধেন্দু যেন মস্ত এক রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। তাই একটু জোর দিয়ে বলল—আচ্ছা শান্তনুকে তোমার একটু বিচিত্র ধরণের মনে হয় না! না গম্ভীর না আত্মোভোলা। না বদমেজাজি, না হাসিখুসি, কখনও ওকে মন খুলে হাসতে দেখলাম না। কখনও দেখলাম না—কোন কারণে শোক দুঃখে কাতর হতে। ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।

এবার রাজাগোপালন বাধা দেয়। তোমার বক্তৃতা ছাড়; এসব

আমার জানা আছে। এর সাথে এই আণ্ডার কারেন্টের সম্পর্ক কোথায় বল ?

সেটা বলার জন্যই তো এই বক্তৃতার দরকার ছিল। তুমি অস্বীকার করতে পার—শান্তনুর এই রহস্যময় চরিত্রের মূল উৎস সন্ধানের জন্য আমাদের দু-জনের মনেই একই ধরণের একটা চেষ্টা আছে, আই মীন একটা আণ্ডারকারেন্ট আছে।

রাজাগোপালন আগ্রহ ভরে অর্দ্ধেন্দুর কথা শুনছিল। শকুন্তলার ব্যাপারে ও নিজেও একটু অবাক হয়ে গিয়েছে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে অর্দ্ধেন্দুর দিকে ফিরে বলে—ঠিক বলেছ। আজ সেই আণ্ডার-কারেণ্টটার জোর বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। সত্যি, শান্তনু নিজে নিমন্ত্রণ করেও শকুন্তলার কথা একবারও জিজ্ঞেস করল না। কেন বল তো, লজ্জায় ?

অর্দ্ধেন্দু একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজাগোপালনের দিকে আরেকটা এগিয়ে দিয়ে একটু ভ্রূটা কুঁচকে বিজ্ঞের মত বলল—না, না লজ্জায় নয়। আসলে শকুন্তলাকে ওর মনেই ধরে নি। কার্ড দেওয়া একটা নিছক ফরমালিটি। বুঝলে ?

রাজাগোপালন সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে থেমে যায়—তুমি কি বলছ অর্দ্ধেন্দু ? শকুন্তলার মা তো নিশ্চিন্ত হয়ে আছে—একটা ভাল পাত্র জুটে গেছে ভেবে। মেয়েকে নিয়ে ওর কম চিন্তা ছিল না। আমাকে অজস্র সাধুবাদ জানিয়েছে সে জন্য।

এবার অর্দ্ধেন্দুও চিন্তিত হয়। সিগারেটটায় একটু জোরে টান দিয়ে বলে, তাই নাকি ; তাহলে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে বল।

রাজাগোপালন এবার একটু আশ্বস্ত করে অর্দ্ধেন্দুকে—না, না, তুমি ঠিক ধরতে পার নি। শান্তনু লজ্জায় আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করে নি। ওর ভ্যানিটিতে লাগবে যে। এতদিনের কৌমার্য ব্রত

নষ্ট হতে চলেছে, সেটা কি চারটিখানি কথা। দেখ নি সমস্ত সময় ওর চোখ-ছুটো কাকে যেন খুঁজে বেড়িয়েছে।

অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালনের কথায় আস্থা রাখতে পারে না। বেশ জোর দিয়েই বলে,

তুমি জান না রাজাগোপালন। দেয়ার ইজ সাম মিস্ট্রি বিহাইণ্ড ইট।

রাজাগোপালন কাঁধ ছুটো একটু ঝাঁকিয়ে, হাতের আঙুলগুলো বাঁকিয়ে ঠোঁটছুটো উল্টে একটা অদ্ভুত মুদ্রা দেখিয়ে সিগারেটটা ফেলে দেয় একেবারে সরস্বতী কুণ্ডে।

তিন

অর্দ্ধেন্দুরা চলে গেলে পর শান্তনু সোজা গিয়ে নিজের ঘরে বিছানার উপর শরীরটা এলিয়ে দিল। জুতো মোজা পর্যন্ত খোলার মত মনের অবস্থা তার তখন ছিল না।

য়্যুনিভার্সিটিতে চাকুরী নেবার পর—মাসিমার বাড়ি থেকে ও নিজেই ক্যানটনমেণ্টের এই বাড়িতে চলে এসেছে। বেশ সুন্দর একটা ফ্ল্যাট। খুব অল্প ভাড়া।

এই নায়না এলিজাবেথকে কেন্দ্র করেই মাসির সাথে ঝগড়া করে সে এই বাড়ীতে চলে এসেছে। সে প্রায় বছর পাঁচেকের কথা।

শান্তনু স্থির থাকতে পারে না। তার অস্থির মন চলে যায় অতীতের অতল-তলে। শান্তনুর আবছা আবছা মনে পড়ে, একদিন তার ইভামাসি তাদের মীরাটের বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন এই এলাহাবাদে। শান্তনুর ঠিক মনে পড়ে না কি কারণে তারা মীরাটের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। বোধহয় পুলিশের ভয়ে। ইভামাসির কাছেই সে শুনেছে, পুলিশ নাকি তাদের এলাহাবাদ অবধি তাড়া করেছিল। কিন্তু কেন, সে কথাটা কোনদিনই ইভামাসি বলেন নি।

শান্তনু ইভামাসিকে কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় করত। কিছু বললেই বলতেন—দেখ শান্তনু, আমার জন্যই তুমি আজ এতবড় হয়েছে। তোমার মা নেই, বাবা নেই, দু-জনেরই অভাব আমি মিটিয়েছি। ছোটবেলা থেকে তোমায় কেমন করে মানুষ করেছি—তা তুমি জান না। এর চাইতে বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। বলতে পারবো না।

শান্তনু আর ভাবতে পারে না। সে সব দিন গেছে বটে। দীর্ঘ তিরিশ বছরের কথা। উঃ, আর ভাবা যায় না। বার বার মনে পড়ছে—ইভামাসির কথা। তিনি বেঁচে আছেন কিনা শান্তনু জানে না। গত পাঁচবছরে একবারও তাঁর খবর নেয় নি। নেওয়া সম্ভব ছিল না। মনে পড়ছে নায়নার কথা।

শান্তনু ডি. এস. সি. হয়েছে—একথাটা তার জানবার কথা নয়। তবু তাকে এ্যামফিথিয়েটারে দেখেছে। নাঃ সে ভুল করে নি। নায়নার মুখ সে ভুল করতে পারে না। পেছনের সারির সমস্ত আইডিনটিক্যাল ফেসের মধ্য থেকে ঐ একটা মুখই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বোধহয় ঐ একটা দৃষ্টিতেই ছিল কিছু বিস্ময়, কিছু অবিশ্বাস—কিছু বিদ্বেষ...না, না নায়না অতটা একৃত্রিম হতে পারবে না।

শান্তনু আর ভাবতে পারে না। উঠে গিয়ে হাত মুখটা একবার ভাল করে ধুয়ে আসে। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মোছার সময় বাথরুমের আয়নায় একবার মুখটা ভাল করে দেখে নেয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে নিজেরই চেহারাটার দিকে। হ্যাঁ এই সেই শান্তনু গুপ্ত। ডি. এস. সি। ভাবতে ভাবতে টাইটা একবার ঠিক করে নেয়। পকেট থেকে রুমালটা বার করে আরেকবার মুখটা ভাল করে মুছে নিল। এই সেই শান্তনু গুপ্ত, ইভামাসির অবহেলায় আর নায়নার অবজ্ঞায় গড়া একটা মানুষ।

নায়নার সেই কথাগুলো আজও তার কানে বাজছে—শান্তনুকে তুমি মানুষ করতে পারলে না মাসি। বি. এস. সি পাশ করালে ছোটবেলা থেকে এত বড় করলে, সে কি এতবড় একটা অপদার্থ করার জন্য। এখন বলে কিনা, চাকুরী করে ও সমস্ত পয়সাগুলো ঢালবে ঐ অনাথ-আশ্রমের পিছনে। ও মানুষ না। হি ইজ এ

কাউয়ার্ড। মা-কে যে দেখে না তাকে আর যাই বলি না কেন মানুষ বলতে পারি না।

শান্তনু সেদিন চুপ করে থাকতে পারে নি। বহুদিন সে নায়নার অনেক কথা সহ্য করেছে। মাসির ভয়ে কিছু বলতে পারে নি। শান্তনু সেদিন দৃঢ় গলায় বলেছিল—তুমি ভুল করছ নায়না, উনি আমার মা নন। মাসি।

মায়ের চাইতেও বড়। তাই তুমি এমন কথা বলতে পারলে শান্তনু।

শান্তনু দৃঢ় হলেও রূঢ় হয় নি। শান্ত কণ্ঠেই বলেছিল, এটা আমার আর ইভামাসির ব্যাপার। এর মধ্যে তুমি নাক গলাতে আস কেন?

নায়না সেদিন খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল—কেন বলব না। উনি তো আমারও মাসি। আমারও তোমারই মত দাবী আছে তাঁর উপর। আমাকেও তিনি তোমার চাইতে কম ভালবাসেন না।

এবার শান্তনু একটু খোঁচা দেয়—তোমার তো আর রক্তের সম্পর্ক নয়। ইউ আর ডটার অব মিস্টার এণ্ড মিসেস্ টেলর। ইউ আর মিস্ নায়না এলিজাবেথ টেলর। আমি শান্তনু গুপ্ত আর উনি মিসেস্ ইভা গুপ্ত আমার মাসি। এবার বুঝতে পারলো কার দাবীটা বেশী।

নায়না অবাক হয়ে গিয়েছিল শান্তনুর এ কথা শুনে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে 'অনাথ-আশ্রমের' জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করতে চলেছে তার মুখে একি কথা। নায়না স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না।

শান্তনুর মনে পড়ছে সেইদিনকার নায়নার সেই অবস্থার কথা। আজকের দেখা মুখের সাথে সে মুখের অনেক পার্থক্য। সে দিন সে মুখে ছিল শুধু ঘৃণা আর বিদ্বেষের অভিব্যক্তি। ছিল একটা তীব্র অহং-বোধের আত্মপ্রকাশ।

শান্তনুর মনে পড়ে সে কথা শুনে ইভামাসি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসেন। যা সেই দীর্ঘ জীবনে শান্তনু কখনও করতে দেখে নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি এসে শান্তনুর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন।

এতদিন তোমায় এই শিক্ষা দিয়েছি। বলেছিলাম না নায়না তোমার বোনের মত। খেয়াল নেই সে কথা। ও ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর থেকেই দেখছি তোমার কেমন একটা কমপ্লেক্স গ্রো করেছে। তোমাকেও অনেক সুযোগ দিয়েছি পড়াশুনা করার। তুমি পার নি। লজ্জা করে না তোমার নায়নাকে অপমান করতে?

শান্তনুর মনে আছে ইভা মাসির সে চেহারার কথা। শান্তনু আরেকবার বেসিন'এর কাছে গিয়ে ঘাড়ে মুখে জল দেয়।

এরপর ইভা মাসি খুব দৃঢ় গলায় বলেছিলেন—আশা করি, একটি চড়েই তোমার শিক্ষা হয়েছে। শোন শান্তনু—তোমায় সাতদিনের সময় দিলাম. এর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা তোমার করে নিতে হবে। কোনদিন মানুষ হতে পারলে তোমার মুখ দেখিও।

সেদিন নায়না কি বলেছিল ইভামাসিকে শান্তনুর ঠিক মনে নেই। কারণ সে কথা শোনার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

শান্তনু আবার এসে বিছানায় শোয়। একটু চা খেতে পারলে ভাল হয়। চিন্তার হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। যত সব আজে-বাজে চিন্তা। সেই কবে পাঁচ বছর পূর্বে ঘটেছে সব ঠিক মনেও নেই। সে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। বিশেষ করে নায়না এলিজাবেথের কথা। একদম মনে ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে ইভামাসির কথা মনে পড়ত। সে জোর করে সেটাও তাড়িয়ে দিয়েছিল। য়ুনিভার্সিটি, পড়াশুনা আর গোপনে গোপনে সেই 'ঈশপস্ অরফেন হোম'—এছাড়া আর কোনকিছুই

তার মনে এই পাঁচ বছরে স্থান পায় নি। পেতে সে দেয় নি। কিন্তু আজ কেন এমন করে তাকে সেই সব পুরানো চিন্তাগুলো চেপে ধরছে। কিছুতেই সরাতে পারছে না। ভারি রাগ হচ্ছিল অর্দ্ধেন্দু আর রাজাগোপালনের উপর। 'সী ইজ সিটিং থ্রী রো'জ বিহাইণ্ড আস।' ওরা অত কথা না বললে তো এরকম হত না।

আবার সেই নায়নার কথাই মনে পড়ে। সে অনেক দিন আগেকার কথা। স্কুল-জীবনের কথা। একদিন ইভামাসি তাকে নিয়ে গিয়েছিল নায়নাদের বাড়ি। ইভামাসির সাথে কেমন করে এই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস্টার আর মিসেস টেলরের পরিচয় হল শান্তনু জানত না। ইভামাসির কাছে শুনেছে মীরাটেই নাকি তাদের সাথে তাঁর পরিচয়।

বেশ বড়লোক বলে মনে হয়েছিল শান্তনুর এই টেলর পরিবারকে। তখন একদম বাংলা বলতে পারত না। ইভামাসির ও বাড়ীতে ডাক পড়েছিল নায়নাকে বাংলা শেখাবে বলে।

ইভামাসিকে ওরা খুব খাতির করতো। ইভামাসির সমস্ত ব্যাপারই চিরকাল শান্তনুর কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। কতদিন বলেছেন শান্তনুর বাবা মার ফটো দেখাবেন, কিন্তু কোনদিন দেখান নি। নায়না কতদিন এই নিয়ে ওর সাথে ঠাট্টা করেছে "শান্তনু, ইউ ডোনট্ হ্যাব পেরেণ্টস্?"

শান্তনু বুঝতে পারত না নায়নার কথা, বলত, হোয়াট আর পেরেণ্টস্, নায়না?

নায়না খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত।

ইউ ডোনট্ নো। ফাদার এণ্ড মাদার!!

ফাদার এণ্ড মাদার?

ইয়েস, এ্যজ আই হ্যাব, মিস্টার এণ্ড মিসেস্ টেলর।

এই নায়নাই তাকে প্রথম ফাদার এণ্ড মাদার কি বুঝিয়ে দিয়েছিল।

আজও স্পষ্ট মনে আছে সে কথা। ইভামাসিকে এর পর ও কত পীড়াপীড়ি করেছে বাবা মার ফটো দেখাতে। কতদিন নাম জানতে চেয়েছে, ইভামাসি বলেন নি। শুধু বলেছেন—তাঁরা ছিলেন, এখন নেই। কি হবে তাদের কথা শুনে। শান্তনু বকুনির ভয়ে বেশী প্রশ্ন করতে ভরসা পেত না। শান্তনুকে ইভামাসি একটা কনভেন্টেই ভর্তি করে দিয়েছিলেন। স্কুলে ওর নিজেকে বড় একলা মনে হত। কেউ বিশেষ মিশত না। শান্তনুর ভারি অস্বস্তি বোধ হত। যতক্ষণ স্কুলে থাকত সকলেই এক কথা জিজ্ঞেস করত, ইউ ডোন্‌ট হ্যাভ পেরেণ্টস্ শান্তনু?

সব সময় এই নিয়ে ওর সাথে ঠাট্টা করত। অনেক বাঙ্গালী ছেলেও পড়ত সেই স্কুলে। সকলকেই মনে হত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

একটা ঘটনার কথা শান্তনুর মনে পড়ে। শান্তনুর হাসি পেল। একদিন ডেভিডকে কি মারই না দিয়েছিল। ভারি দুষ্টু ছেলে ছিল এই ডেভিড। রোজ রোজ ওর সাথে বাবা মার নাম নিয়ে ঠাট্টা করত।

একদিন শান্তনু ওর কলার চেপে ধরেছিল। ঘুসির পর ঘুসি চালিয়েছিল। যতক্ষণ না বলেছিল ও নিজেও তার বাবা মার নাম ভুলে গিয়েছে শান্তনু রেহাই দেয় নি।

খুব হাসি পেল শান্তনুর। ডেভিড বলেছিল, আই সোয়ার, আই কানট্ রিমেম্বার মাই পেরেনটস্ নেইম।

এ রকম আরও অনেক ঘটনাই মনে পড়তে থাকে শান্তনুর। বিশেষ করে ইভামাসির কথা। নায়না বোধহয় তার ডি. এস. সি হওয়ার খবরটা ইভামাসিকে দেবে। আর ঈর্ষা পরবশ হয়ে নায়না যদি নাই দেয়, ইভামাসি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখবেন। মনে মনে কেমন এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে শান্তনু।

চার

শকুন্তলার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল রাজাগোপালনের। মাদ্রাজ য়্যুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বহু ভাল ভাল ছেলে নাকি তার প্রেমে পড়েছিল। প্রফেসাররাও বাদ পড়েন নি। এ রকম আরও কত রোমান্টিক ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে। সেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে শকুন্তলা রাজাগোপালনের কাছে সমগ্র পুরুষ জাতটার বিরুদ্ধেই কত অভিযোগ করেছে। বলত, বুঝলে রাজাগোপালন, অল মেন আর ডার্টি। মেয়ে দেখলেই ওদের জিভ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। আই ক্যান বেট, যে-কোন পুরুষকে সাতদিনের মধ্যে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াতে পারি।

রাজাগোপালনের মনে হচ্ছিল সব মিথ্যে কথা। শকুন্তলা সব মিথ্যে বলেছে। শকুন্তলাকে ও-ই একপ্রকার শান্তনুর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল এতে কাজ হবে। নিজের জোরে না হোক অন্তত শকুন্তলার জোরে শান্তনুকে ধরে একটা চাকুরী যোগাড় করতে পারবে। মিস্ রমানার জোরে এরকম কত লোকের চাকুরী হয়েছে এলাহাবাদ বিশ্ববিত্যালয়ে।

অনেকের ধারণা মিস্ রমানার নাকি দিল্লীর বড় বড় মহলেও অনেক হাত আছে। এই নিয়ে মিস্ রমানাকে কেন্দ্র করে এলাহাবাদের কাগজে কাগজে কত কেলেঙ্কারীর কথা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে কতদিন।

মিস্ রমানা সে সমস্ত শুনে মুচ্‌কি হেসে নাকি বলতেন—এ সব তো স্ত্রীলোকের ভূষণ। কলঙ্ক না থাকলে খ্যাতি হবে কি করে?

অর্দ্ধেন্দু আর রাজাগোপালন মিস্ রমানার সাফল্যের কথা

স্মরণ করেই মিস্ শকুন্তলাকে নিয়ে এসেছিল মান্দ্রাজ থেকে। শকুন্তলা রাজাগোপালনের দূর সম্পর্কের বোন।

হাতী পোষার মত শকুন্তলা ও তার মার সমস্ত খরচাই গত এক বছর ধরে বহন করতে হয়েছে রাজাগোপালন ও অর্দ্ধেন্দুকে। অর্দ্ধেন্দুর ভাবনা কম। তার বাবা পাটনা হাইকোর্টের নাম করা এড্ভোকেট। এখনও বাপের টাকায় ছেলের বাবুগিরি। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার করে ফিরিয়ে আনার। ছেলের ইচ্ছে অন্য রকম। সায়েনটিস্ট্ হয়ে দেশের কাজে আত্মনিবেশ করা। তাই এ্যাপলাইড্ কেমিস্ট্রি নিয়ে এম. এস-সি পড়া।

রাজাগোপালনের সাথে অর্দ্ধেন্দুর নিবিড় সম্পর্কের কারণ— তারা শুধু সহপাঠীই নয়, একই রোগের রোগী, বেকার। দুজনেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব বাস্তব জীবনে অসাফল্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত দিন গেছে তত জ্বালা বেড়েছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও দু-বছর বসে থাকায় লোকের সন্দেহ বেড়েছে। কত ইনটারভিউ-বোর্ডে শুনতে হয়েছে—ইউ মাস্ট হ্যাব জয়েনড্ সাম পার্টি। আদার ওয়াইজ হোয়াট ইজ দি রঙ উইথ ইউ?

তাই গত দুবছর ধরে তারা দুজনে বিজ্ঞান ছেড়ে সোসাল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করছে।

একদিন রাজাগোপালন দৌড়ে এসেছিল অর্দ্ধেন্দুর কাছে। অর্দ্ধেন্দুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ইউরেকা, ইউরেকা। পেয়েছি পেয়েছি।

অর্দ্ধেন্দু অবাক হয়ে গিয়েছিল—

কি পেয়েছ?

রাজাগোপালন আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলে, শকুন্তলা—

শকুন্তলা? ও আবার কে?—

আরে ঐযে তোমাকে ফটো দেখিয়েছিলাম।

অর্দ্ধেন্দু একটু ভ্রূ কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার কেমন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া হন।

একজ্যাকটলি!

তাকে দিয়ে আমাদের কি হবে? অর্দ্ধেন্দুর চোখে বিস্ময়।

রাজাগোপালন পরম উৎসাহ ভরে বলেছিল—অনেক কিছু হবে। তুমি ভাবতেও পারছ না অর্দ্ধেন্দু, এই দু-বছরের পরিশ্রমে সোসাল সায়েন্সের মূল রহস্যটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। দেখবে এবার সিওর সাক্সেস। শকুন্তলার মাকেও আসতে লিখেছি।

অর্দ্ধেন্দু বুঝতে পারেনি সেদিন রাজাগোপালনের সে কথা। শকুন্তলা এসেছে, তার মা এসেছে, এই এক বছর ধরে রাজাগোপালন তাকে এই কথাই বলে এসেছে। অনেক খরচ বলে মাসের পর মাস ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে। অর্দ্ধেন্দু টাকার জন্য ভাবে না। যতদিন বাবা থাকবেন টাকার অভাব হবে না।

সেদিন এমফিথিয়েটারে শকুন্তলাকে দেখে অর্দ্ধেন্দু বুঝেছিল রাজাগোপালনের টেক্‌নিকটা কি!

রাজাগোপালনের আর ভাল লাগছিল না। শুধু শুধুই সে এক বছর ধরে অর্দ্ধেন্দুর টাকাগুলো জলে দিয়েছে। নিজেরও তো কম খরচ হয় নি। সাত সাতটা টিউশনির টাকা।

শান্তনুকে দেখে অর্দ্ধেন্দুই বলেছে—দেয়ার ইজ সাম মিস্ট্রি বিহাইণ্ড ইট।

মিস্ট্রি আবার কি! কিছুই না। অর্দ্ধেন্দু তো জানে না। এখানে আসার পরই ও শান্তনুকে শকুন্তলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। শান্তনু প্রথম প্রথম ভাল রেসপণ্ড করেছে। শকুন্তলাকে নিয়ে বেশ ঘোরাঘুরিও করেছে। আর সেই শান্তনুই কিনা সেদিন তাকে নিমন্ত্রণ করে একবার কথাও বলল না। রিয়েলী দেয়ার ইজ সাম মিস্ট্রি বিহাইণ্ড ইট। রাজাগোপালনের মনে

হচ্ছিল তাকে বোধহয় আবার নূতন করে সোসাল সায়েন্স পড়তে হবে।

নূতন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে বলে রাজাগোপালনের ভরসা কম। তবে একটি কথা সে খুব বুঝতে পারছে। অল উইমেন আর নট লাইক মিস্ রমানা।

তবু রাজাগোপালন আশা ছাড়তে পারছে না। শান্তনুর কাছে সে হেরে যাবে। অসম্ভব, এ সে কিছুতেই হতে দেবে না। অনেক আশা করে সে শকুন্তলাকে এনেছে। অর্দ্ধেন্দুকে ইচ্ছে করেই কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। পাছে এক হতে আর হয়ে যায়। এক বছর ধরে সে চেষ্টা করেছে। এর কোন ফলশ্রুতি হবে না? রাজাগোপালন দৃঢ় হয়।

শান্তনুকে সে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না। তার যে এছাড়া অন্য কোন কোন পথ নেই। এম. এস-সি পাস করেছে দু-বছর হল। আজ পর্যন্ত একটা চাকুরী যোগাড় করতে পারল না। রেজাল্ট তো সে খারাপ করেনি। ফার্স্ট ক্লাস। এখন শুনছে জিও-ফিজিক্সে নাকি কোন স্কোপ নেই।

সবাই সহানুভূতি জানায়।

এই তো সেদিন অর্দ্ধেন্দুর বাবা বলছিলেন, এত সাবজেক্ট থাকতে তুমি কোন দুঃখে জিও-ফিজিক্স নিয়ে পড়তে গেলে? আই রিয়েলী ফীল ফর ইউ, রাজাগোপালন। তোমাদের মত ব্রাইট ইয়ং মেন কিনা কিছু করতে পারছে না।

তুহিনাংশুবাবু অযাচিত ভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন। নেহাৎ অর্দ্ধেন্দুর বাবা, অন্য কেউ হলে রাজাগোপালন দু-চার কথা শুনিয়ে দিত। তার মুখ দিয়ে একটা কথা তো প্রায় বেরিয়েই এসেছিল। নিজের ছেলের একটা ব্যবস্থা করুন; তারপর আমার কথা ভাববেন।

অর্দ্ধেন্দু সামনে না থাকলে হয়ত বা বলেই ফেলত। খুব কষ্টে

আত্মসংবরণ করতে হয়েছিল। এরকম আরও কত কষ্ট করে কতদিন কত জায়গায় নিজের ভিতরে পুঞ্জীভূত গ্লানি, ক্ষোভ সব কিছু অপ্রকাশিত রাখতে হয়েছে তাকে। উঃ কি ভীষণ সে জ্বালা, সে দাহ!

রাজাগোপালন ভাবতে পারে না। বেকারীর চাইতে মানুষের এই করুণা, সহানুভূতি, উপদেশ তার বেশী অসহ্য বলে মনে হয়।

কোথাও গেলেই প্রথম কথা, কি পাশ, কি করেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দপ করে জ্বলে-ওঠা আগুনের শিখার মত মুখখানি, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, শীতল জলের ছিটায় সিক্ত এক ফুৎকারে নিভে যাওয়া প্রদীপের শিখার মত মলিন হয়ে ওঠে।

পাশাপাশি একই মুখমণ্ডলের এই দ্রুত পরিবর্তন তাকে বন্ধ করতেই হবে। আর তা পারে একমাত্র শান্তনু। ওর এক কথাতেই তার এই জ্বালা ঘুচতে পারে। তার কেন অর্দ্ধেন্দুরও।

রাজাগোপালন অনেকদিন আকারে ইঙ্গিতে এ কথা শান্তনুকে বুঝিয়েছে। এর চাইতে সোজা করে আর সে বলতে পারবে না। শান্তনু যে বুঝতে না পারে তার কথা তা নয়। কিন্তু কেন জানি সে অকারণেই সে প্রশ্ন এড়িয়ে যায়।

রাজাগোপালনের খুব রাগ হয় শান্তনুর উপর। মনে হয় খুব স্বার্থপর সে। নিজের প্রফেসরসিপটাই এখন তার কাছে বড় কথা। বন্ধুদের বেকারিত্ব ঘোচানোয় তার বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

রাজাগোপালন যতই ভাবে ততই তার গোঁ বাড়তে থাকে। শান্তনুর বন্ধু হিসাবে তার চাকুরী না হতে পারে কিন্তু শকুন্তলার ভাই বলে তো একেবারে ফেলে দেবার পাত্র নয়! তার উপর যদি সে যা ভেবেছিল তাই হয়।

রাজাগোপালনের হাসি পেল। না, শান্তনুকে সে শালা বলার

স্কোপ দিতে পারে না। শেষকালে নিজেকে শালা বানিয়েও চাকুরী পাওয়া যাবে না।

রাজাগোপালনের চিন্তা থেমে যায়। আর এগোতে পারে না। সিগারেট খাবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। এক্ষেত্রেও আত্মসংযমের পথ নিতে বাধ্য হয়। মনে হচ্ছিল বেকারদের তো কাজের মধ্যে ঐ একটি—আত্মসম্বরণ। রেষ্টুরেণ্টে যাওয়া কমিয়েছে। দু-বছর সিনেমা বন্ধ। আমোদ-স্ফূর্তি নির্বাসিত। শুধু অর্দ্ধেন্দুর সাথে ঘোরা, তাও পায়ে হেঁটে—সরস্বতীকুণ্ড পর্যন্ত।

বাধ্য হয়েই রাজাগোপালন সারাদিনের রেশন-করা চারটে সস্তাদরের সিগারেটের একটা অনেক কষ্টে পকেট থেকে বার করে রাস্তার-ধারে পানের দোকানের দিকে গেল। সেখানে বোধহয় বিনে পয়সায় আগুনের অভাব হবে না।

পাঁচ

ইভামাসিকে আর খবরের কাগজে শান্তনুর ডি. এস-সি হবার সংবাদটা পড়তে হয় নি। সেদিন কনভোকেসন থেকে ফিরে নায়নাই সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল ইভামাসির বাড়ি। ইভামাসি প্রথমে বিশ্বাস করতে চান নি। ভেবেছিলেন নায়না শান্তনু সম্বন্ধে বিদ্রূপ করছে। গত পাঁচ বছর ধরে শান্তনু সম্বন্ধে তাদের এ রকম ধারণাই হয়েছে।

নায়না প্রায়ই বলত, দেখলে মাসি, আমি বলেছিলাম। শান্তনু ইজ ভেরি আন্‌গ্রেটফুল। তোমার কথা একবারও ভাববে না। হি ইজ্‌ নট্‌ ওন্‌লি সেল্‌ফিস্‌ বাট্‌ ইরেসপনসিবল্‌ টু।

ইভামাসি প্রথম প্রথম বলত—না, না, নায়না তুমি ভুল করছ। অভিমান কেটে গেলেই ও আসবে। দেখ, নিশ্চয় আসবে।

নায়না একটু ব্যঙ্গ করে বলত—সত্যি মাসি, তুমি মানুষ চিনলে না। ওতো নিজের মুখেই বলে গেল, তুমি ওর মা নও, মাসি। কথা শুনে বুঝলে না, মাসির জন্য ওর কোন দরদ নেই।

ইভামসি নায়নার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারত না। চড তো ওকে আমিই মেরেছিলাম। আমিই তো চলে যেতে বলেছিলাম। ও তো আমার কথার অবাধ্য হয় নি, নায়না। আমারই উচিত একবার ওর খবর নেওয়া। তুমি একটু দেখ না চেষ্টা করে কোন খোঁজ খবর পাও কিনা।

নায়না অনুনয়ের সুরে বলেছিল—একস্‌কিউজ মি, মাসি, আমি পারব না। খবর নিতে গিয়ে আবার হেনস্থা হই আর কি। ইফ হি ডাজ্‌ নট্‌ রিটার্ন, প্লীজ ট্রাই টু ফরগেট হিম।

নায়নার কথায় ইভামাসির ধারণা হয়েছিল শান্তনু আর

ফিরবে না। শুধু ফেরাই নয়, হয়ত তাকে ভুলেই গিয়েছে। এমনি করেই দিনের পর দিন মনের জোর সঞ্চয় করে নায়নাকে বলেছিলেন, তুমি ঠিক বলেছ নায়না। শান্তনু মানুষ না। ওর কথা আর কোনদিন মুখেও আনব না। লেট আস কমপ্লিট্‌লি ফরগেট হিম।

এরপর ইভামাসি নায়নাকে কোনদিন শান্তনুর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করেন নি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে রান্না করার সময় অথবা দুপুরবেলা ঘুমাবার পূর্বে কেন যে বার বার শান্তনুর কথা মনে পড়ত এ প্রশ্নটা নায়নাকে জিজ্ঞেস করার মত মনের জোরও পান নি।

শান্তনু সম্বন্ধে ইভামাসির দুর্বলতাটুকু দূর করতে পেরেছে ভেবে নায়নাও একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

এর পরে ঘটনার দ্রুত গতি। একদিকে শান্তনুর এম. এস-সি পাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী। আরেকদিকে তার চেয়েও আকস্মিকভাবে নায়নার বিয়ে।

এলাহাবাদ ডিস্ট্রিক্ট-এর ডেপুটি কমিশনার মাইকেল জওহর কোহলীর সাথে। বলতে গেলে লভ এ্যট ফার্স্ট সাইট। টেনিস কোর্টে প্রথম দেখা। ভীষণ ভাল লেগেছিল নায়নার এই কোহলীকে। সিভালরাস বটে। খৃষ্টান না হলে এমন হয়। কি ভদ্র ব্যবহার। কেমন সহজেই স্বীকার করে নিল—আই এ্যাকসেপ্ট, আই হ্যাব কোর্টেট ডিফিট এ্যট ইউর হ্যাণ্ড। ইউ আর রিয়েলী ইউনিক্‌ নায়না।

শান্তনুর সাথেও ও টেনিস খেলেছে। একদিন নয় বহুদিন। বলতে গেলে শান্তনুকে নায়নাই টেনিস খেলা শিখিয়েছিল। শিখেছিলও ভাল। শেষকালে নায়না ওর কাছে জিততে পারত না। কিন্তু একদিনও ও নায়নাকে এর জন্য ধন্যবাদ জানায় নি। নায়না তাকে খেলা শিখিয়েছিল বটে। কিন্তু বহু চেষ্টা করে স্পোর্টস্‌ম্যানসিপটা শেখাতে পারে নি। আফ্‌টার অল ক্রিশ্চিয়ান কাল্‌চারটা তো শান্তনুর মধ্যে নেই।

কোহলীরও নায়নার মন বুঝতে বেশীদিন লাগে নি। তার বাবা ছিলেন আমেরিকনা মা পাঞ্জাবী। মিঃ আর মিসেস টেলর এরকম পাত্রের কথা ভাবতেও পারে নি। আই. এ. এস এক ডেপুটি কমিশনার তাদের জামাই হবে। ইভামাসিকে তাদের সেদিন খুব বড় বলে মনে হয়েছিল। ইভামাসি না থাকলে আজ তাদের এ সৌভাগ্য হত না।

বিয়ের পার্টি থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে যাবার দিন পর্যন্ত কি ইভামাসি কি নায়না কেউ আর শান্তনুর কথা বলে নি। এতবড় একটা আনন্দানুষ্ঠানে যখন শান্তনুর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল না, তখন ইভামাসি ও নায়না উভয়েই উভয়ের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে ভেবে দুজনেই একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল।

বিদায় নিতে গেলে ইভামাসি কাঁদেন নি। অবশ্য তিনি যে কাঁদবেন এতটা নায়না আশা করে নি। বলেছিলেন—তুমিও চল্লে নায়না।

নায়না কিন্তু চোখের জল রোধ করতে পারে নি। যদিও সে চোখের জল ফেলাটা দুর্বলতাই মনে করে। রুমাল দিয়ে জল মোছা আরও বড় দুর্বলতা, তাই জল না মুছেই নায়না বলেছিল—বেশী দূরে তো যাচ্ছি না, মাসি। এই এলাহাবাদেই আছি। প্রায়ই আসব।

নায়না তার কথা রেখেছিল। গত পাঁচ বছর নিয়মিত ইভামাসির খোজখবর নিয়েছে। কোহলীর সাথে মাসিকে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরেছে। ঘুরতে ঘুরতে কতদিন ইভামাসির মনে হয়েছে হয়ত আচমকা শান্তনুর সাথে তাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে, কোন পার্কে, রেষ্টুরেন্টে অথবা সিনেমা হাউসে।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ নায়না এসেই শান্তনুর খবর দেবে এ কথা ইভামাসি কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রথমে হয়েছিল বিস্ময় পরে সন্দেহ।

তিনিও দমবার পাত্র নন। কোন রকম ভাবান্তর না দেখিয়ে বলেছিলেন—তাতে আমার কি?

নায়না বিস্মিত হয়। সে কি মাসি? তুমিই না বলেছিলে; মানুষ হতে পারলে মুখ দেখাবি।

ইভামাসি তেমনই দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—তুমি কি মনে কর ও মানুষ হয়েছে?

এবার নায়না শঙ্কিত হয়—এখন সে য়ুনিভার্সিটির রীডার; ডি. এস-সি. তাও তুমি মনে কর মানুষ হয় নি?

না।—ইভামাসি দাঁতে দাঁত চাপেন।

কেন?

কেন আবার। ও মানুষ হলে নিশ্চয় ওর মুখ দেখাতে আসতো। অন্তত ওর প্রতি আমাদের আচরণের পাল্টা জবাবটাও দিয়ে যেত।

ইভামাসির কথায় নায়নারও ভাবনা হয়। সত্যিই তো শান্তনু কি প্রতিশোধ নেবার কথাটাও ভুলে গেছে। নায়নার খুব আশ্চর্য মনে হয়। অনেক কথাই নায়নার মনে পড়তে থাকে। পাঁচ বছর পূর্বে ওর সাথে ওরকমভাবে কথা কাটাকাটি না হলে আজ সে এত বড়ই হতে পারত না। কৃতজ্ঞতা না হোক, সেদিন এমফিথিয়েটারে সে নায়নাকে দেখে অন্তত একটা অবজ্ঞার হাসিও হাসতে পারতো। এ্যাট লিস্ট সাম এক্সপ্রেসন তার মুখে আশা করেছিল নায়না। না সে রকম কিছু সে করে নি। চিনতে পেরেছে বলেই মনে হল না। ভারি আশ্চর্য।

নায়না অনেকক্ষণ ধরে সেদিন শান্তনুকে লক্ষ্য করেছিল।

কেমন ভাবলেশহীন মুখের চেহারা। এত লোকের হাততালি, এ রকম অদ্ভুত কৃতিত্ব, কোন কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে নি।

নায়নার আরও অনেক কথাই মনে পড়তে থাকে। একদিন নায়নাই টেনিস খেলার মাঠে বলেছিল,--শান্তনু, তুমি যে বেশ ভাল খেলা শিখে ফেলেছ দেখছি।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে শান্তনু বলেছিল--চেষ্টা করলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।

কি নায়না, চুপ করে অত কি ভাবছ? আমায় কথার জবাব দিলে না তো? ইভামাসির ডাকে নায়নার চিন্তা বাধা পায়।

তুমি শান্তনুর খবর পেলে কি করে?

আমি কেন, সমস্ত এলাহাবাদ জানে শান্তনুর খবর। পেপারে পড়েন নি?

না।—ইভামাসির ছোট্ট উত্তর।

কেন? কনভোকেসনের দিন সকালের পেপারে ফটো দিয়ে বড় বড় হরফে শান্তনুর কথা ছাপা হয়েছিল। আপনি পড়েন নি? ফটোও দেখেন নি!

দেখেছিলাম, কিন্তু পড়ি নি। ছবিটাও না দেখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি করি একেবারে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছবি।

নায়নার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি—এতবড় সংবাদটা আপনি পড়েন নি?

পড়লে ভাল হত না।

কেন? নায়না ইভামাসিকে বুঝবার চেষ্টা করে।

কেন আবার। তাহলে তোমারই মত আরেকবার এম্‌ফিথিয়েটার থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হত।

নায়না এবার একটু সংযত হয়।

পড়লেই কনভোকেসনে যেতে হত। এমন কোন কথা ছিল না।

ইভামাসির মুখে একটু মলিন হাসির রেখা ফুটে ওঠে—তাহলে তুমি গিয়েছিলে কেন?

নায়না মোটেও এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কোন সদুত্তর না পেয়ে অযথাই শাড়ির আঁচলের পাড়টা মোচড়াতে থাকে।

ছয়

ইভামাসির বাড়ি থেকে ফিরে এসে নায়নার সে রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় নি। বার বার ইভামাসির সেই একটি প্রশ্ন তার মনে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। তাহলে তুমি গিয়েছিলে কেন?

এটা ইভামাসির অন্যায় প্রশ্ন। বেশ করেছিল। কেন, কোন কনভোকেসনে বুঝি যেতে নেই। তাছাড়া ওরা তো ইনভাইটেড গেস্ট। যে সে কথা নয়। সে ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী। ইচ্ছে করলেই একদম ফ্রন্ট রো-তে, শান্তনুদের সাথেই বসতে পারতো।

তাহলে এই সাধারণ উত্তরটা ইভামাসিকে কেন দিতে পারল না। বোধহয় ইভামাসি এরপর আরেকটা নাছোড়বান্দা প্রশ্ন করত। ফ্রন্ট রো ছেড়ে থার্ড রো-তে কেন বসেছিল। না ইভামাসি ভারি বেয়াড়া প্রশ্ন করেন। ওতো আর শান্তনুর ডি. এস-সি. নেওয়ার ঘটনা দেখতে যায় নি। গিয়েছিল মহীশূরের মহারাজের কনভোকেসন এড্রেস শুনতে। সেই কনভোকেসনে শান্তনুর ডি. এস-সি. পাওয়া একটা মিয়ার কয়েনসিডেন্স্ ছাড়া কিছুই নয়।

নায়নার ভারি রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এই সামান্য কথাটাও ইভামাসিকে বলতে পারে নি। ছি, ছি, একটা সামান্য প্রশ্নে এত বিব্রত বোধ করেছিল। তাছাড়া ইচ্ছে করেই নায়না ফার্স্ট রোতে বসে নি, শান্তনুকে একটু অনুগ্রহই করেছে। কর্ম-কর্তারা নিশ্চয় ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী বলে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিত। শান্তনুকে অবশ্যই ভদ্রতার খাতিরে প্রথম অভিবাদন করতে হত। ভাগ্যিস্ সেদিন মিঃ কোহলী ছিলেন না। তাহলে শান্তনুকে খুব অকওয়ার্ড পজিসনে পড়তে হত।

মিঃ কোহলী আজও ফেরেন নি। আই. এ.এস'এর কি একটা ট্রেনিং সংক্রান্ত ব্যাপারে মুসৌরী গিয়েছেন। আরও তুই তিন দিন পর ফিরবেন।

নায়নার খুব একলা বোধ হচ্ছিল। কিছুটা অসহায়ও। ইভামাসি কি ভাবল ওকে। ও-ই প্রথম শান্তনুর কথা বলল। গত তিন বছরে ইভামাসি একদিনও শান্তনুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি।

নায়নার ভারি খারাপ লাগছিল। আরও কতদিন এরকম একলা থেকেছে। কোনদিন এত অস্বাস্ত বোধ হয় নি। ডিসেম্বর মাস পড়ে গেছে। ঠাণ্ডা নেহাৎ কম না। তবুও কেন জানি বেশ গরম লাগছিল নায়নার। উঠে গিয়ে ঘরের জানালা তুটো সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ল। না। এবার ঘুমোবার একটু চেষ্টা করতেই হবে। আচ্ছা ভ্যানিটি তো শান্তনুর। ওদিন একটু হেসে বললেই পারত—দেখলে তো নায়না, তোমরা যা ভেবেছিলে, আমি তা নই। মাসিকে বোলো আমি মানুষ হয়েছি।

একথা বললে নায়না নিশ্চয় কিছু বলতে পারতো না। হয়ত মাসির সাথে ওর পারিবারিক কলহটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টাও করত। নায়না ওরকম অকৃতজ্ঞ নয়।

ভ্যানিটিটা শান্তনুর চিরকালের। ওর মুখে সব সময় ঐ কথাই ছিল—চেষ্টা করলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।

বি. এস-সি পরীক্ষায় শান্তনু ভাল রেজাল্ট করেনি। নায়না ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। সেদিনও শান্তনু সেই একই কথা বলেছিল।

ইভামাসি খুব চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুই কি মন খুলে কাউকে কনগ্রাচুলেটও করতে পারিস্ না?

শান্তনু নিরুত্তাপ কণ্ঠেই জবাব দিয়েছিল, তেমন কোন এচিভ্‌মেণ্ট দেখলে নিশ্চয়ই করব।

মাসি খুব রেগে গিয়েছিলেন একথা শুনে। তোর কাছে এচিভমেণ্ট কোন্‌টা শুনি।

শান্তনু চট্ করেই উত্তর দিয়েছিল,—

অরফেন হোমের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা।

মাসির রাগ তখনও কমে নি—তুই কি মনে করিস্ তুই ওদের মানুষ করবি?

শান্তনু নায়নার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না করা অবধি কোন এচীভ্‌মেণ্ট হয়েছে বলে মনে করব না।

নায়নার ছোটেবলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। সেদিন সে আর শান্তনু ফিরছিল ক্যান্‌টনমেণ্টের কন্‌ভেণ্ট স্কুল থেকে। শান্তনু ছোটবেলায় কেমন একটু বোকা বোকা ছিল। ওর বহু অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে নায়নাকে বহুদিন।

বাড়ি ফেরার পথে ক্যান্টনমেণ্টেরই বড় রাস্তার উপর মস্ত একটা বাড়ি। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। নায়নার বাবা রোজই ওদের ফেরার পথে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতেন। শান্তনুকে নামিয়ে দিয়ে যেতেন ইভামাসির বাড়ি।

নায়নার বেশ স্পষ্ট মনে পড়তে থাকে সে সব দিনের কথা। কম ঝামেলা পোহাতে হয়েছে শান্তনুকে নিয়ে? সেদিন কি কারণে বাবার গাড়ি আসেনি। ওরা দু-জন হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল। ঐ বাড়িটার কাছে শান্তনু এসে থমকে দাঁড়ায়। নির্বোধের মত প্রশ্ন করেছিল—

হোয়াট ইস দিস্ হাউস নায়না?

নায়না বাড়িটার মস্ত ফটকের উপর অর্ধবৃত্তাকার সাইন-বোর্ডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল,—

সি উইথ ইওর ওন আইজ।

শান্তনু ধীরে ধীরে পড়েছিল,—

ইশপস্ অরফেন হোম।

তারপর ভ্রূটা কুঁচকে নায়নার দিকে তাকিয়ে নেহাতই ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করেছিল—

অরফেন হোম কি নায়না ?

নায়নার ভারি রাগ হয়েছিল—খুব চটে বলেছিল,—

অনাথ আশ্রম ; বুঝলে, অনাথ আশ্রম।

অনাথ মানে কি ?

নায়না খুবই চটে গিয়েছিল। শান্তনুর এই 'কি' 'কেন' প্রশ্ন সুরু হলে আর রক্ষে থাকবে না।

শান্তনুকে একদম স্তব্ধ করে দেবার জন্য বলেছিল,—

অনাথ, মানে পেরেন্টলেস্। যার বাবা-মা নেই, লাইক ইউ, বুঝলে! ডোন্ট আসক্ এনি মোর কোস্চেন।

শান্তনু এর পর কোন প্রশ্ন করে নি। দৌড়ে গিয়েছিল মস্ত ফটকটার মধ্যে। নায়না প্রথমে বুঝতে পারে নি। যখন টের পেল, তখন শান্তনুকে ডাকার উপায় নেই। ততক্ষণে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

নায়নার ইচ্ছে হয়েছিল একাই বাড়ি ফিরে যাবে, কিন্তু শান্তনু যেরকম বোকা, বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। বাধ্য হয়েই নায়নাকে শান্তনুর খোঁজে যেতে হয়েছিল।

ভিতরে ঢুকতেই নায়না দেখেছিল শান্তনু এক অতি বৃদ্ধ লম্বা দাড়িওয়ালা পাদ্রীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। শান্তনুর প্রশ্নে সেই বৃদ্ধকেও খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল। ফাদার ইশপকে নায়না চেনে। তাদের বাড়ি প্রত্যেক মাসের ঠিক সাত তারিখে যায়—এই অরফেন হোমের জন্য ডোনেসন চাইতে। ভিক্ষা করাটা নায়নার বেশ অপছন্দ। কিছু না পাওয়া অবধি ঠায় বসে থাকত অনেকক্ষণ।

নায়না শুনেছিল—ফাদার ইশপ বলছিল—দে অল হ্যাব লস্ট দেয়ার পেরেন্ট, মাই বয়।

শান্তনু বৃদ্ধের কথায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল ওর মুখ দিয়ে ছোট্ট একটি কথা অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এসেছিল—হাউ ?

ফাদার ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেছিল—

তা তুমি বুঝবে না। বড় হও বুঝতে পারবে।

শান্তনুকে নায়না আর এগুতে দেয় নি। ওর হাতে একটা হেঁচকা টান মেরে গেটের বাইরে নিয়ে এসেছিল।

শান্তনু একটুও বাধা দেবার চেষ্টা করে নি। বোধহয় কোন সামর্থ্যও ছিল না।

নায়নার আজও মনে পড়ে, সেদিন বাড়ি ফেরার পথে শান্তনু বলেছিল—দে অল আর মাই ব্রাদার্স এণ্ড সিস্টারস্, নায়না।

নায়না নাক সিটকে বলেছিল,—

অল বেগারস্, ডার্টি পুওর ফেলোজ।

তবে কি শান্তনু তার ডি. এস-সি পাওয়াটাকেও কোন এ্যচিভ্মেন্ট বলে মনে করে না? হয়ত তাই, সেই বুড়ো ইশপ্ তো বহুদিন হল আর চাঁদা চাইতে আসে না। ঠিক শান্তনু মাসির বাড়ি ছেড়ে যাবার কয়েকমাস পর থেকেই তার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ নায়নার খেয়াল হয়। এ সব তো তার ভাববার কথা নয়। সে না ক্রিশ্চিয়ান গার্ল। দুর্বলতা তার শোভা পায় না। যীশু বলেছেন, দুর্বলতা মহাপাপ। নায়না হাঁটু গেড়ে বিছানার উপর উঠে বসে মাথাটা একটু হেলিয়ে ডান হাতটা দুই কাঁধে ছুঁইয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি বলে আবার শুয়ে পড়ল। গরমে তখন সমস্ত শরীর তার ভিজে গেছে।

নায়না বেড সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল। দেওয়ালে টাঙান মস্ত ওয়াল ক্লক্টার দিকে একবার তাকায়। চমকে ওঠে নায়না। রাত্রি দুটো বাজে। সমস্ত বাংলোটা নিঝুম নিস্তব্ধ। তাদের এই বাংলোটা সহরের থেকে একটু দূরে। এখান থেকে ইভামাসির মাউন্ট রোডের বাড়িটা তো প্রায় মাইল দশেক। এলাহাবাদ

ক্যানটনমেণ্ট খুব কাছে। ছোটবেলা থেকেই এই এলাকার সাথে নায়নার পরিচয়। এই ক্যানটনমেণ্টেরই লরেটো স্কুল থেকে সে হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। চিরকালই এদিকটা সহরাঞ্চলের চাইতে কম চঞ্চল। মিলিটারির কড়া ডিসিপ্লিন আর প্রাকৃতির প্রশান্তি এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নায়নার অন্তত তাই মনে হত।

নিস্তব্ধতা যে শুধু বোরিংই নয়, খুবই ভয়ঙ্কর আজ নায়না প্রথম টের পেল। একটা সুঁচ পড়লেই সেই আওয়াজ শুনতে পারবে। বাংলোর লনটার ওপারে সারভেণ্ট আউট হাউজ থেকে কারুর নাক ডাকার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ঘড়ির টিক্ টিক শব্দ এক সেকেণ্ড থেকে পরের সেকেণ্ডে ব্যবধানটা যেন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। নায়নার ভারি বিশ্রী লাগছিল। কখন ভোর হবে! এখনও তিন ঘণ্টা কি করে কাটাবে এই দীর্ঘ সময়। নায়নার মনে হল ওয়াল ক্লকটা স্লো চলছে। নির্ঘাত স্লো। নইলে টিক্ টিক্ আওয়াজগুলো এত দেরীতে হচ্ছে কেন! নায়না অনেকক্ষণ ধরে গুনল, ঠিক ষাট শেষ হতেই রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল। এখানেও ঘড়ির কাঁটা ঠিক এক মিনিটই এগিয়েছে। বিরক্ত হয়ে রিস্ট-ওয়াচটা খুলে নায়না মাথার কাছে রাখা ছোট্ট পেগ-টেবিলের উপর রেখে আবার শুয়ে পড়ল। বেড সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল।

শুধু নিস্তব্ধতাই নয় অন্ধকারও এত ভয়ঙ্কর। একি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! আবার সেই ভাবনা। চোখ বুঁজলে বেশী। ইভামাসি যেন কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলছেন—তাহলে তুমি গিয়েছিলে কেন?

না সে এই প্রশ্নের জবাব দেবে না। কেন দেবে? না, জবাব সে দেবে, সেই জবাবের জন্যই তো তার এত ভাবনা। কালই গিয়ে সে ইভামাসিকে বলবে, সে গিয়েছিল শান্তনুর জন্য নয়—

নমন্ত্রণ রক্ষা করতে। না, শান্তনুর কথা সে মুখেই আনবে না। লে ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী হিসাবে তার অবশ্যই যাওয়া উচিত ছল। বিশেষ করে মিঃ কোহলী যখন এলাহাবাদে নেই। এ রকম উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের স্ত্রীরও একটা কর্তব্য আছে।

শান্তনু যে ধরণের লোক, হয়ত সেই অরফেন হোমের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ডি. এস-সি নেবার পরিবর্তে একটা ডিমনেসট্রেসনই করে বসল। ভি. আই. পি. দের অপমানই করে দিল। তাহলেই কেলেঙ্কারীর একশেষ। সে রকম কিছু ঘটলে কোহলীর উপর অনেকখানি দায়িত্ব বর্তাত। তার স্ত্রী হিসাবে এদিকটাও তো নায়নার ভাবা দরকার। বিশেষ করে শান্তনু যে রকম ইরেসপনসিবেল ছেলে। ডি. এস-সি হওয়া এক কথা। আর দায়িত্বশীল হওয়া আরেক কথা। খাওয়া-পরার কথা শুনিয়ে অরফেন হোমের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা বিক্ষোভ মিছিল বার করা আজকাল খুবই সহজ।

অবশ্য শান্তনু এর চাইতেও বড় বড় বুলি আওড়াত। বলত—

জান নায়না, অরফেন হোমের ছেলেগুলো আমাদের সমাজের সব শ্রেণীর লোকের টারগেট। এম. এল. এ-দের টারগেট মিছিলের অঙ্গ স্ফীত হবে বলে। পকেটমারদের টারগেট তাদের আয়ের অংশ বাড়বে বলে। দালালদের টারগেট মেয়ে ব্যবসায় রাতারাতি বড়লোক হবে বলে। এমন কি পুলিশদের টারগেট একটা ডিফেন্সলেস ছেলে পেলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সহজেই প্রমোসনের পথটা সুগম করতে পারবে বলে।

নায়না বিদ্রূপ করত—তা তোমার ঐ বুড়ো পাদ্রী ইশপ সাহেব কি ঘাস কাটেন নাকি? ও কি করে?

শান্তনুর মুখটা মলিন হয়ে যেত।

কি করবে বল, তারও তো টাকা দরকার। তিনশো ছেলেমেয়ের এই হোম। আগলে রেখে না খাইয়ে তো মারতে পারে না। একটু অদৃষ্টের উপরও ছেড়ে দিতে হয়।

শান্তনুর কথায় নায়নার ঘৃণা হত। বলত,—

তা বলে সেই বুড়ো পাদ্রীটা এ সমস্ত অন্যায় কাজের সহায়তা করবে ?

শান্তনু বোঝাবার চেষ্টা করত,—

না নায়না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, অন্যায় কাজের ঠিক সহায়তা করেন না, করতে বাধ্য হন।

নায়না শান্তনুর কথায় জ্বলে উঠত।

শাট আপ। আর তুমি সেই পাদ্রীকে সাহায্য কর। প্রতিমাকে জোর করে ইভামাসির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও। বুঝেছি এ ম্যান ইজ নোন বাই হিজ কম্পানি।

এহেন শান্তনুর পক্ষে সেই নোংরা পরিবেশের ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়ে যা তা করা কিছুই অসম্ভব নয়। অরফেন হোমের ছেলেমেয়েগুলোই তার সব হল। আর নায়না যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তার সঙ্গে এক সাথে কাটাল, তাকে চিন্‌তেও পারল না। না চিনতে সে পেরেছিল। রিকগনাইজ করল না। বন্ধু দুটোও জুটিয়েছে ভাল। একটার নাম যেন কি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজাগোপালন। সাউথ ইণ্ডিয়ান। ভীষণ অসভ্য। সারাক্ষণ কথা বলে ডিসটার্ব করেছে। শান্তনু ওদের সাথেও বিশেষ কথা বলছিল না। নায়নার মনে হল সমস্ত অরফেনগুলোই বুঝি এরকম। কারুর সাথে মিশতে পারে না। বিশেষ শান্তনুর তো নায়না সম্বন্ধে চিরকালই একটা কমপ্লেক্স ছিল। মিঃ আর মিসেস টেলর তার একটা বিশেষ কারণ।

টং, টং, টং। তিনটা বাজল।

এক ঘণ্টা কেটে গেল এত তাড়াতাড়ি। কৈ সে তো এতক্ষণ ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ শুনতে পারে নি। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মনটা তো হালকা লাগছে না। তাহলে সে ঘুমোয় নি। নায়না আবার আলো জ্বালে। অসাবধানতাবশত তারটা

লেগে পেগ-টেবিলের উপর থেকে একটা গ্লাস পড়ে গেল। বিকট আওয়াজে নায়না চমকে ওঠে। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে মিঃ কোহলীর ড্রিঙ্ক করার ছোট্ট গ্লাসটার টুকরো অংশগুলি। নায়না অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেগুলির দিকে।

মিঃ কোহলী বলত—জান নায়না আমাদের ড্রিঙ্ক করতে হয় অনেক কারণে। কখনও একস্ট্রা এনারজি পেতে, কখনও সম্মান বজায় রাখতে, কখনও বা সূক্ষ্ম বিচারের রায় দিতে। আবার কখনও বা মনকে ভুলিয়ে রাখতে।

নায়না আবদার করে বলত,—আমি বিশ্বাস করি না, ড্রিঙ্ক করে আবার মনকে ভোলান যায় নাকি? প্লীজ এরকম বাজে অজুহাত দিয়ে আর ড্রিঙ্কের মাত্রাটা বাড়িও না। শেষকালে মাতাল হবে নাকি?

মিঃ কোহলী নায়নার কোমরটা ধরে কাছে টেনে, এক হাতে চিবুকটা তুলে ধরে, আরেক হাতে ছোট্ট গ্লাসটা দেখিয়ে বলত—

দেখই না এক সিপ টেনে, কেমন লাগে। মাতাল হবার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। হোয়াট এ গ্রেট প্লেজার ইট ইজ।

নায়না এ গন্ধ সহ্য করতে পারতো না। তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলত—

যাঃ, কি হচ্ছে এসব। চাকর বাকর দেখলে কি ভাববে বল তো!

কোহলীকে তখন নেশায় ধরেছে। একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বলত—

আই রিয়েলী ফিল পিটি ফর ইউ, নায়না। এ ক্রিশ্চিয়ান গার্ল হ্যাজ নো চেস্‌টিটি উইথ-আউট ড্রিঙ্কস্‌।

প্রথম প্রথম নায়নার খুব ভয় হত। তুমি দেখছি সত্যি মাতাল হলে।

মিঃ কোহলী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতেন সে কথা শুনে। নায়নার কাছে অসহ্য মনে হত সে হাসি। হাসতে হাসতেই বলতেন—

ইয়েস, আই নো, তোমারও দিন আসবে। আসবে ডারলিং, সে আমার মৃত্যুর পরেই হোক, বা আগেই হোক। ইউ উইল ফিল লোন্‌লী। ইয়েস লোনলী, এ্যকসট্রিমলি লোন্‌লী। তখন দেখবে—দিস ড্রিঙ্ক উইল বি ইওর গ্রেট ফ্রেণ্ড। দেখো মাতাল হওয়া কত সুখের।

নায়না তখনও তাকিয়ে ছিল সেই গ্লাসের টুকরো অংশগুলোর দিকে। একটা টুকরো তুলে নিল। নাকের খুব কাছে এনে ভাল করে শুঁকে দেখল। হ্যাঁ, এখনও সেই গন্ধ আছে। বাঃ বেশ লাগছে। কি সুন্দর গন্ধ, ভারি মিষ্টি। শরীরটা বেশ ঠাণ্ডাও লাগছে। উঃ এতক্ষণ একেবারে ঘামে নেয়ে গিয়েছিল। ড্রিঙ্ক এত ভাল জিনিস। মিঃ কোহলীকে সে বিশ্বাস করে নি। সত্যি এ ক্রিশ্চিয়ান গার্ল হ্যাজ নো চেস্‌টিটি উইদ-আউট ড্রিঙ্কস। কোহলী তুমি ঠিক বলেছ। আই মাষ্ট টেস্ট ইট। না, না, নো টেস্টিং, আই মাসট্‌ ড্রিঙ্ক। মাস্‌ট ড্রিঙ্ক টু ফরগেট।

কখন যে উঠে এসে নায়না মস্ত আলমারিটার কাছে দাঁড়িয়েছে টেরও পায় নি। ঐতো কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে—বিভিন্ন লেভেল আঁটা শিশিগুলো। হুইস্কি, জিন, রাম, শ্যামপেন। বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে আছে। কতদিন এই আলমারি খুলে সে নিজের হাতে কোহলীকে ঢেলে দিয়েছে—একটার পর একটা বোতল খুলে। প্রথম প্রথম রুমাল চাপা দিত নাকে। কোহলী রাগ করত বলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিত। নায়নার ভারি হাসি পেল সে কথা ভেবে। কি ছেলেমানুষীই না সে করেছে।

আলমারীর দরজাটা সে খুলে ফেলেছে। যে কোন একটা বোতল সে তুলে নিতে পারে। না রহমানের দরকার হবে না। এত রাত্রে সোডা সে কোথায় পাবে। আর বোতল সে নিজেই খুলতে পারবে।

নায়না একটা হুইস্কির বোতল তুলে নেয়। হাতটা কেঁপে উঠল। ভারি রাগ হল নায়নার নিজের উপর। আবার ঘামতে শুরু করেছে। সে না ক্রিশ্চিয়ান? দুর্বলতা মহাপাপ। এবার দৃঢ় হয়। মুখ দিয়ে কেটে বোতলটা খুলে ফেলে। দাঁতের মধ্যে ছিপিটা আটকে যায়। একটু ব্যথাও লেগেছে বলে মনে হল। নায়না অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারল না, কোহলী কেমন করে মদ খেত। মদ খাওয়ার সাথে অন্য ড্রিঙ্কের কোথাও একটা তফাৎ আছে। অনেক খুঁজেও সে আলমারির মধ্যে কোথাও কোন স্ট্রর বাক্স দেখতে পেল না।

বিরক্ত হয়ে মুখটা উঁচু করে বোতল থেকে বেশ খানিকটা ঢেলে দিল মুখে। উঃ কি জ্বালা করছে গলাটা, বুকটাও, হ্যাঁ পেটেও গিয়েছে। না এ জ্বালা সহ্য করা যায়। নায়না ফ্যানটা ফুল স্পীডে ছেড়ে দিয়ে, বোতল হাতে বিছানায় গিয়ে বসল। আঃ কি আরাম! নায়না বোতলটার দিকে তাকায়। একবার নিজের গালে ঘষে। ইয়েস ইউ আর রিয়েলী মাই ফ্রেণ্ড। পারহ্যাপস্ এ বেটার ফ্রেণ্ড দ্যান এনি-ওয়ান। ইউ গিভ অনলি প্লেজার এণ্ড নো ওরি, নো, এ্যাঙ্গজাইটি। কোন ভাবনা না, কোন চিন্তা, না। ওনলি প্লেজার।

নায়না আরেকবার বোতল থেকে অনেকখানি ঢেলে দেয় গলায়। সমস্ত কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ তাইতো, ফ্যানটা নিজে থেকেই থেমে গেল। শাড়ির আঁচলটাও খসে পড়ছে, হ্যাঁ আলোটাও নিভে যাচ্ছে, বোতলটা হাত থেকে পড়ে গেছে, আরেকটুকু যে আছে। না, আর দরকার নেই। ঐ তারাও চলে যাচ্ছে। ঐযে শান্তনু ইভামাসি সব। হ্যাঁ সব। কেউ নেই। শুধু ও একা। আস্তে আস্তে আলোটাও নিভে যাচ্ছে। ঐযে শান্তনু দরজা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে সেই ডি. এস. সির মানপত্রটা। ওঃ এখনও অবজ্ঞা। একবার

দেখাবেও না। নায়না প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসতে হাসতেই বিছানায় এলিয়ে পড়ে—নায়না উইল রিমেন ফার বিয়ণ্ড ইওর রীচ শান্তনু। সী ক্যান ফরগেট ইউ লাইক এনিথিঙ্গ।

সে হাসির প্রচণ্ড দাপট ডিসেম্বরের এক শীতের শেষরাত্রে সেই নিঝুম নিস্তব্ধ ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় কোন চাকর-বাকরের সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিনা সে ভাবনা ভাবার অবসর নায়না এলিজাবেথের তখন ছিল না।

সাত

মে আই কাম ইন প্লীজ।

একটা কোমল নারীকণ্ঠে শান্তনুর পড়ার ব্যাঘাত ঘটে। এইমাত্র য়্যুনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে। তারই লেখা একটা আরটিকেল বেরিয়েছে আজ পেপারে। কেমন করে অনাথ অথবা সমাজের অবাঞ্ছিত ছেলে-মেয়েদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই সম্বন্ধে লেখা।

দরজাটা ভেজানই ছিল। শান্তনু আধা-বিরক্তির সুরে বলে—

ইয়েস কাম ইন।

এই সবে ফিরলেন বুঝি য়্যুনিভার্সিটি থেকে? শকুন্তলার মুখে মৃদু হাসির রেখা।

শান্তনু শকুন্তলার মুখে স্পষ্ট বাংলা শুনে খুব অবাক হয়ে যায়।

হাউ কুড ইউ পিক আপ বেঙ্গলী সো কুইক্‌লি।

শকুন্তলা এমনই একটা প্রশ্ন আশা করেছিল, আপনিই না সেদিন বলেছিলেন, চেষ্টা করলে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।

শান্তনুর বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটে নি। বলেছিল, ওটা আমার ধারণা ছিল মাত্র। কিন্তু বাস্তবে তার এমন রূপ দেখব আশা করি নি।

শকুন্তলাও চট করে জবাব দেয়,—

আপনিও যে এত তাড়াতাড়ি ডি. এস-সি হবেন ভেবেছিলেন ?

শান্তনু এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। শকুন্তলা কি করে জানল এ কথা। শুধু কথাই নয়, শকুন্তলার আচার-আচরণও আজ খুব রহস্যময়। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের নিখুঁত সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে। এ রকম শকুন্তলার সাথে ইতিপূর্বে তার পরিচয় হয় নি। কোথায় সেই প্রগল্ভ কথাবার্তা, সেই স্বল্প-বাসে সজ্জিতা, বেশভূষা, রুজ, লিপস্টিকে আঁকা মুখের ছবি, তার চাইতেও বড় কারণে অকারণে স্খলিত-বসনা সেই নারী। কপালের টিপটাও মানিয়েছে খুব। মাথার উপরে সেই বিরাট খোঁপাটা নেই। তার পরিবর্তে এই প্রশান্ত প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়েই যেন এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর থেকে একটা বিনুনী। ভারি অদ্ভুত লাগছিল শকুন্তলাকে। কে বলবে মাদ্রাজ য়্যুনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট। ঠিক যেন সদ্য বিশ্বভারতী থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা নিজ গুণে অসাধারণ এক সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে।

বিশ্বাস করছেন না বুঝি বাংলার কালচারটা আমরা টোটালি এ্যকসেপ্ট করতে পারি। শকুন্তলার বাংলা উচ্চারণে কোথাও কোন জড়তা নেই।

শান্তনুর তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি।

ইট ইজ রিয়েলী এ্যন এচীভমেণ্ট।

এবার শকুন্তলা একটু আবদারের সুরে বলে, উঁহু, আর বিদেশী ভাষা নয়। রাজাগোপালন বলেছিল ইংরেজি ছেড়ে ভারতের যে কোন ভাষা শিখতে পারলে অনেক লাভ। বেশ একটা দেশী-আমেজ পাওয়া যায় তাতে :

শান্তনু এবার শকুন্তলাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারে না— এবার দেখছি আপনার থেকে তামিলটা না শিখতে পারলে, এর প্রতিদান দিতে পারব না। একি আপনি দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।

শান্তনু উঠে একটা চেয়ার এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

থাক থাক, আমিই টেনে নিতে পারবো।

শকুন্তলা একটা চেয়ার নিয়ে শান্তনুর খাটের সামনে বসল।

শান্তনু জিজ্ঞেস করল—তাহলে বলুন কবে থেকে শেখাবেন।

শকুন্তলা বেশ গম্ভীর হয়ে যায়।

না আপনার আর এ পাগলামি করতে হবে না।

শান্তনু আহত হয়। পাগলামি, পাগলামি কোথায় দেখলেন! আপনিই না বললেন ভারতের যে কোন ভাষা শিখলে একটা আমেজ পাওয়া যায়।

শকুন্তলা তেমনই ধীর গলায় বলে—

আমেজ পাওয়া তো একটা বিলাস মশাই। আপনি যা করছেন, তা করলে যে একটা দেশী মন পাওয়া যায়। এটার যে আজকাল খুব অভাব।

শান্তনু বুঝতে পারে না শকুন্তলার কথা।

আমি আবার কি করলাম?

কি আবার? ভাবছেন আমি জানি না? আজ পেপারে আপনার আর্টিকেলটা পড়েছি। সত্যি মনে মনে এত পরিকল্পনা আছে আপনার?

শান্তনু চমকে ওঠে শকুন্তলার এ প্রশ্নে। যে কাজকে কেন্দ্র করে তার ইভামাসির সাথে বিচ্ছেদ, নায়নার সাথে ছোটবেলা থেকেই মনোমালিন্য, যে কাজ আজ পর্যন্ত কেউ সমর্থন করে নি, এমন কি অর্দ্ধেন্দু, রাজাগোপালনও নয়, সেই কাজের প্রতি শকুন্তলার এ প্রশ্ন ব্যঙ্গোক্তি না সমর্থন, শান্তনু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

শকুন্তলা বলতে থাকে,—

আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা আপনার মত উচ্চশিক্ষিত, সদ্-বংশজাত রুচিবান ভদ্রলোক কি করে সেই অধস্তন অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়েদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছেন। যতই বলুন মিঃ গুপ্ত, সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করা আর

তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া এক কথা নয়। আপনার আর্টিকেল পড়ে আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না আপনি তাদের থেকে আলাদা। য়্যুনিভার্সিটির একজন রীডার ডি. এস-সি। কি দরদ দিয়েই না ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের ব্যথা বেদনার ইতিহাস।

শান্তনু আশ্বস্ত হয়। বলে—

সত্যি বলছেন আপনি? দেখেছেন তো সেই অরফেন হোমের মেয়েগুলোর কি দুর্দশা! ইস্কুলে নেবে না, চাকুরী, বাকুরীতে স্থান নেই, বিয়ে হয় না, কি অসহনীয় অবস্থা বলুন দেখি? সরকারি-অরফেন হাউস-এরও একই দশা। সেখানে ওদের জন্য স্কুল আছে বটে কিন্তু সমাজের আর দশটা সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের মত ব্যবহার তারা পায় না। স্কুলে হেড-মাস্টার থেকে আরম্ভ করে দারোয়ান পর্যন্ত সবাই মনে করে তারা শুধু স্কুলের ছাত্রই নয় সবার চাকরও বটে। ফাদার ইশপের স্কুলের চাইতেও তাদের দুরবস্থা। এখানে অন্তত তারা ফাদারের মত একজন দরদী মানুষ পেয়েছে।

শকুন্তলা লক্ষ্য করে শান্তনুর কণ্ঠে আবেগের স্পর্শ। শকুন্তলার অদ্ভুত মনে হয় এই মানুষটিকে। সেদিন হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের হাততালি তাকে বিচলিত করতে পারে নি। ভাইস-চান্সেলারের বক্তৃতা কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি শান্তনুর উপর। অন্য অন্য সব পুরুষের থেকে শান্তনু আলাদা। একেবারে ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

এতদিন শকুন্তলার ধারণা ছিল ছেলেরা আর কোথাও না হোক মেয়েদের সান্নিধ্যে এসে অন্তত বিচলিত হবেই। শান্তনুই তার প্রথম ব্যতিক্রম। শকুন্তলা এতে যত না হয়েছে বিস্মিত তার চাইতে বেশী হয়েছে আহত। এটা কি শান্তনুর অহংকার না চরিত্রের মাধুর্য—এ প্রশ্ন তাকে বহুদিন ভাবিয়ে তুলেছে।

পুরুষ মারার সমস্ত মেয়েলী কলা-কৌশলই সে গত এক বছর

ধরে শান্তনুর উপর এ্যাপলাই করে দেখেছে। শিকার বড়শীতে গাঁথার কোন লক্ষণই সে কোনদিন দেখতে পারে নি। রাজা-গোপালনের কাছে এ নিয়ে তাকে কম কথা শুনতে হয় নি। রাজাগোপালনের কথায় তার জিদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তার তূণের সমস্ত বাণগুলোই সে ছাড়তে থাকে একের পর এক শান্তনুর উদ্দেশ্যে। বাঁকা চোখের চাপা চাহনি, অকারণে কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচল খসে পড়া নরম বুকের গরম স্পর্শ, এর যে কোন একটাতেই সে বহু পুরুষকে একেবারে ধরাশায়ী হতে দেখেছে। হল না কিছু শান্তনুর। শান্তনু শকুন্তলার জীবনে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

আহত বাঘিনীর মত শকুন্তলা শেষে তার সর্বশেষ মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছিল। কোন নারীই সেটা সহজে প্রয়োগ করে না। বোধহয় প্রয়োজন হয় না বলে।

এ অস্ত্র প্রয়োগে সাকসেস্ যেমন অবধারিত, তেমনই কোন কারণে ফেইলিওর হলে অপমানের একশেষ। সিওর না হয়ে কখনও প্রয়োগ করা উচিত নয়। শকুন্তলা সিওর হয়েই তা প্রয়োগ করেছিল. এ অস্ত্র প্রয়োগেই যে মাদ্রাজ য়্যুনিভার্সিটির এক ষাট বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপককেও কাবু করেছিল। বোধহয় সে কারণে তার ভাল রেজাল্ট করতেও অসুবিধা হয় নি। অন্যান্য অধ্যাপকদের উপরও সেটা এ্যাপলাই করতে পারলে হয়ত তার ফার্স্ট হওয়াটাও অসম্ভব হত না। কিন্তু ঘন ঘন অস্ত্র প্রয়োগ করলে অস্ত্রের ধার কমে যায়। শেষকালে কাজ করে না। ভবিষ্যৎ জীবনে আরও বহুবার সে অস্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন হয়েছিল শান্তনুর বেলায়। অযাচিত ভাবেই সে সুযোগ একদিন শকুন্তলার এসেছিল। জোর করেই শকুন্তলা শান্তনুকে সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। শকুন্তলা জানত এতে কাজ হবে।

শান্তনুও ভাল রেসপণ্ড করেছিল।

একবার অভিনয়ের ফাঁকে শকুন্তলার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলেছিল, সী হোয়াট এ নাইস পিকচার ইজ দিস, সাউণ্ড অব মিউজিক।

শকুন্তলা এই সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল। সাথে সাথে শান্তনুর গা ঘেঁসে কানের কাছে মুখটা নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল। হোয়াট এ্যবাউট ফটোগ্রাফি?

শকুন্তলা সেই আধো আলো, আধোঁ অন্ধকারে স্পষ্ট দেখেছিল শান্তনুর চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে।

শান্তনু বলেছিল—এক্সেলেণ্ট!

এরপর ছবির ফাঁকে ফাঁকে বহুবারই শকুন্তলা শান্তনুর গায়ে গা ঘষে বহু প্রশ্ন করেছিল। যদিও শান্তনুর উত্তরের মধ্যে কোন অসংলগ্নতা ছিল না, তথাপি শকুন্তলা লক্ষ্য করেছিল শান্তনু তার নরম বুকের গরম স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করে নি।

ছবির শেষে শান্তনু বলেছিল—

হোয়াট এন একসেলেণ্ট ক্যারেকটার ইজ দিস মারিয়া।

কথায় কথায় শকুন্তলা শান্তনুর বাড়িতে এসে পড়েছিল। হ্যাঁ সেদিনও এই ঘরে, এইখানে। ঠিক এরকম অবস্থায় ছিল দুজনে। সেদিনের কথা মনে পড়ে শকুন্তলার আজও কেমন লজ্জা করতে থাকে। ইস্ কি অপমান, কি জ্বালা! এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সেদিনও শান্তনুর কণ্ঠস্বর আবেগ মুখর ছিল। মারিয়ার প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ।

এই আবেগ লক্ষ্য করেই না শকুন্তলা এমন কাণ্ড করে বসেছিল।

হয়ত অস্ত্রটা প্রয়োগ করার পূর্বে শকুন্তলা একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। যেমন হয়েছিল সেই অধ্যাপকের বেলায়। হ্যাঁ তিনিই তো জিজ্ঞেস করেছিলেন—শকুন্তলা তোমার কি শরীর

খারাপ হয়েছে? শকুন্তলা বলেছিল—হ্যা ভীষণ মাথা ধরেছে। বৃদ্ধ অধ্যাপক তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। শকুন্তলা বাধা দেয় নি। তিনি মাথা টিপে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—ডাক্তার ডাকব? শকুন্তলা বলেছিল—না। কোন দরকার নেই। তারপর দীর্ঘ একঘণ্টা সেই বৃদ্ধ তার মাথা টিপে দিয়েছিলেন। বার বার তার স্খলিত আঁচল ঠিক কাধের উপর তুলে দিয়েছিলেন। শেষ কালে আলিঙ্গনে আর চুম্বনে চুম্বনে শকুন্তলার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ আর শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শান্তনুও সেদিন শকুন্তলার হাবভাব লক্ষ্য করে বলেছিল। আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, মাথাটা ভীষণ ধরেছে। সিনেমা দেখলেই এমন হয়। বলে শকুন্তলা নিজের হাতেই কপালটা টিপতে থাকে।

শান্তনুকে বিশেষ বিচলিত বলে মনে হয় নি।

হ্যাঁ, আমারও মাঝে মাঝে এরকম হয়। এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা তো? এই বইটা আবার তিন ঘণ্টারও বেশী। বাহাদুরকে বলি, একটু কফি করে নিয়ে আসুক, দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে।

শকুন্তলা বলেছিল—না থাক দরকার নেই। কপালটা একটু ভালভাবে টিপে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

শান্তনু শকুন্তলার রক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল—আপনার কি খুব মাথা ধরেছে?

হ্যাঁ খুব। বেশ বেড়েছে।

তাহলে আপনি উঠে এসে আমার এই খাটের উপর শুয়ে পড়ুন। বলেই শান্তনু নিজের খাটের উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শকুন্তলা যন্ত্রচালিত কলের পুতুলের মত উঠে গিয়ে নিঃসঙ্কোচে শান্তনুর খাটের উপর শুয়ে পড়েছিল। শান্তনু তাকে হাত ধরে সাহায্যটুকু করে নি।

শকুন্তলা অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে শকুন্তলা চোখ খুলেছিল। শান্তনুকে বলেছিল—আলোটা কাইগুলী নিভিয়ে দিন না। চোখে ভীষণ লাগছে।

শান্তনু আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শকুন্তলার সামনের চেয়ারটায় এসে বসেছিল। কিছুক্ষণ বাদে শান্তনুই বলেছিল—আপনার কি খুব খারাপ লাগছে? বলুন তো ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

শকুন্তলা বলেছিল—না, না ডাক্তার ডাকবেন না। আমার কিছু হয় নি। এখনি ঠিক হয়ে যাবে।

তাহলে একটা এ্যাস্‌প্রো দিই আমার ড্রয়ারেই আছে।

শকুন্তলা বলেছিল—না, আমার কিছুই লাগবে না। আপনি কোথায় শান্তনুবাবু?

এই তো আমি এখানে।

আমার কাছে এসে বসুন না?

কেন?

আমার ভীষণ ভয় করছে।

শান্তনু একটু ঘাবড়ে যায়—ভয়? কিসের ভয়? এইতো আমি এখানেই আছি।

শান্তনু গিয়ে শকুন্তলার শিয়রে বসে।

শকুন্তলা এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসেছিল সেদিন। চকিতে উঠে বসে শান্তনুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে—আপনি কোথাও যাবেন না শান্তনু বাবু, আমার কাছেই থাকুন। আমার ভীষণ ভয় করছে।

শান্তনু প্রথমে হকচকিয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে শকুন্তলার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, ছিঃ, কি পাগলামি হচ্ছে।

আহত হয়েছিল শকুন্তলা সেদিন। নারীর পক্ষে এর চাইতে বড় লজ্জা আর কিছু হতে পারে না। আজও শান্তনুর মুখে সেই সেইদিনের

মত আবেগ ফুটে উঠেছে। আজ তাকে এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

শকুন্তলাকে ও রকম অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকতে দেখে শান্তনু জিজ্ঞেস করে,

আপনিও কি তাদের কথা ভেবে চুপ করে গেলেন নাকি? সত্যি মন দিয়ে ওদের কথা ভাবলে চুপ করে থাকা ছাড়া আমাদের আর কি-ই বা করার থাকে বলুন?

শকুন্তলা মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কেন, আমরা তাদের জন্য অনেক কিছু করতে পারি।

শান্তনু বুঝতে পারে না শকুন্তলার কথা। অবাক হয়ে বলে, কেমন করে?

আপনার মত তাদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে। তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে।

শান্তনু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—এ রকম কথা অনেকেই বলে। সরকারও তাদের জন্য টাকা খরচ করতে রাজি। কিন্তু ওদের সুখ-দুঃখের ভাগ নেওয়া, আপনি যে রকম একটু আগে বললেন ভাষা শেখা একটা বিলাস মাত্র, ঠিক সে রকম এটাও একটা কল্পনা-বিলাস ছাড়া কিছুই না। এই দেখুন না, ইশপ অরফেন হোমের জন্য একজন শিক্ষিত গভরনেসের জন্য কতবার এডভারটাইজমেণ্ট করেছি। একটিও পাওয়া গেল না। আমাদের দেশে কি মারিয়ার মত একজনও পাওয়া যাবে না?

শকুন্তলা শান্তনুর এই কথার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আমি তো আপনার আরটিকেলটা পড়ে এ জন্যই দেখা করতে এসেছি।

শান্তনু বিশ্বাস করতে পারে না—সত্যি আপনি নেবেন গভরনেসের দায়িত্ব? মাইনা কিন্তু বেশী দিতে পারব না।

শকুন্তলার মুখে স্নিগ্ধ হাসি—সে কথা আরটিক্যাল পড়েই টের পেয়েছি।

শান্তনু এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু আপনার মা আর রাজাগোপালন। তারা মত দেবে তো এ চাকুরীতে ?

কেন দেবে না ? শকুন্তলার চোখে বিস্ময়। রাজাগোপালন আজও বেকার। তাদের সংসারের জন্যও তো টাকা দরকার।

শান্তনু কি করে কৃতজ্ঞতা জানাবে বুঝতে পারে না। বলে—ইউ আর রিয়েলী এ ফাইন লেডী। সেদিন রাত্রে আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম।

শকুন্তলা মুখের হাসিটা আরও মধুর করে বলে, আপনাকে কিন্তু আমি চিনেছিলাম।

শকুন্তলার চোখে রহস্য, কৌতুক, বেদনা না আনন্দের অনুভূতি শান্তনু ঠিক ধরতে পারে নি।

আট

রাজাগোপালন একটু আগে থেকে এসেই অপেক্ষা করছিল অর্দ্ধেন্দুর জন্য। কথা আছে তারা দুজনে এসে এই সরস্বতীকুণ্ডে মিট করবে। রাজাগোপালনের এ বিষয়ে একটু সুপারস্টিসন আছে। কোন শুভ কাজে যাবার পূর্বে কুণ্ডের জল মাথায় ছোঁয়ান। এক ফোঁটা চরণামৃতের মত করে খানও।

অর্দ্ধেন্দু অতশত বিশ্বাস করে না। প্রায়ই বলত—কি করলে বাবা এত ভক্তি, বিশ্বাস দেখিয়ে। একটা চাকুরী তো আজ পর্যন্ত বরাতে জুটল না।

রাজাগোপালন একটু খোটা দিয়ে বলত—দেখ, যেদিন কপাল ফাট্‌বে, তুমিও আমায় ঈর্ষা করবে। তখন যেন তোমারও আমার মত সুপারস্টিসন ডেভেলপ না করে।

আজ তাদের দুজনেরই ইনটারভ্যু। রাজাগোপালনের কাশী

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর অর্দ্ধেন্দুর লক্ষ্ণৌর একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে। সকালের ট্রেনে রওনা দিতে পারলে দুজনেই চারটের সময় ইনটারভ্যু বোর্ডে ঠিক হাজির হতে পারবে। তাই আজ এ ব্যবস্থা—সকাল আটটায় সরস্বতীকুণ্ডে মিট করে একসাথে রওনা হওয়া।

রাজাগোপালন বেশ আগেই চলে এসেছে। একবার রিসট-ওয়াচের দিকে তাকাল। সবে সকাল সাতটা। মন্দ লাগছে না রাজাগোপালনের। যমুনার পাড়টা তার ভাল লাগে। বেশ নিরিবিলি। আর একটু এগিয়ে গেলেই 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। কত পার্থক্য এই দু-জায়গায়। সঙ্গমে দিন রাত লোক গম গম করছে। কেউ কেউ আবার বলে 'প্রয়াগ-সঙ্গম'। রাজাগোপালনের মনে হয়, কোনটাই ঠিক না। 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' তো নয়ই। অনেকদিন সে নৌকো ভাড়া করে একেবারে সঙ্গমে গিয়ে লক্ষ্য করেছে—লোকের ভক্তি, বিশ্বাস আর অজ্ঞানতার জেরটা। পাণ্ডারা যাত্রীদের বোঝাত—এই ত 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মহামিলনের স্থান। এখানে স্নান করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। 'ত্রিবেণী' স্নানের পূর্ণ ফল পেতে হলে তিন ধারার নামেই উৎসর্গ করতে হবে তোমাদের। যাত্রীরা তাই করত। দশ টাকা, পাঁচ টাকা করে না হলেও—মিনিমাম রেট পাঁচসিকে করে তিন ধারার নামে সকলকেই উৎসর্গ করতে হত। সর্বসাকুল্যে মিনিমাম তিন টাকা বার আনা। এরপর আছে পাণ্ডাদের প্রণামী, ডাবের দাম, ফল-মূল, দুধ, এমন কি স্নান সেরে নৌকোয় উঠে চন্দনের তিলকের দামটা পর্যন্ত। রাজাগোপালনের মনে হত—নাইস ওয়ে অব এক্সপ্লয়টেসন।

ভক্তি বিশ্বাসের জোরে মানুষ ঠকতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য সকলকে দেখে রাজাগোপালনের মনে হত এরা ক্ষমার

অযোগ্য। এরাই সমাজের এক্‌সপ্লয়টারদের বেশী সুযোগ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে তার মধ্যে যদি কেউ আবার শিক্ষিত হয়। সঙ্গমে নামলে গঙ্গা, যমুনার দু-রঙ্গী জলের ধারায় পূর্ণ মিলন আশ্চর্য রকমভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যস, এতেই লোকের আক্কেল-গুড়ুম। একবারও কেউ জিজ্ঞেস করে না—তৃতীয় ধারাটি কোথায়? যদি কেউ কখনও ফস্‌কে কথাটা বলেই ফেলে—অন্যান্য যাত্রীরা বাধা দিয়ে বলে, আচ্ছা লোক তো আপনি--দেখছেন না মাঝে মাঝে সাদা সাদা জল উপ্‌ছে উপ্‌ছে ওপরে উঠে আসছে। সরস্বতী নদী তো এখানে অপ্রকাশিত। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লোকের ঢালা-দুধ গঙ্গা-যমুনার জলের সাথে মিশে সরস্বতীর শুভ্র বারিবিন্দুতে পরিণত হয়। পাণ্ডারাও এ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করত। কারণ সব সময় দুধের জল ঠিক গঙ্গা-যমুনার মিলন রেখায় এসে ফুটে ওঠে না। এটা নির্ভর করে স্রোতের উপর। যখনই এমন ঘটে পাণ্ডারা চিৎকার করে ওঠে—মা সরস্বতী কৃপা করেছেন। মায়ের বর লাভ করতে হলে শীগ্‌গীর মায়ের কৃপা প্রার্থনা করুন। যার যা আছে নদীতে দিন। কোন কোন যাত্রী বুঝতে পারত না পাণ্ডাদের কথা। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকত তাদের মুখের দিকে। পাণ্ডারা ধম্‌কে উঠত—কি দেখছ আমার মুখের দিকে। যাও নৌকায় গিয়ে কি আছে নিয়ে এস। দেখছ না সাদা জল উঠে আসছে। মহাসরস্বতী প্রকাশ পেয়েছেন। মায়ের আশীর্বাদ পেলে কৃপালাভ করবে। সব পরীক্ষায় ভাল ফল হবে।

যাত্রীদের নির্বুদ্ধিতায় রাজাগোপালনের তাদের উপর মায়া হত। ইচ্ছে হত চেঁচিয়ে সবাইকে বলে দেয়।

—তোমরা শোন, মা সরস্বতী এখানে মেশেন নি। একে 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' বলা ভুল। বলা উচিত 'দ্বিবেণী-সঙ্গম'। সাদা

সাদা যে জল দেখছ, ওগুলো তোমাদেরই পয়সা দিয়ে কিনে ঢালা, দুধের রং। স্রোতের জন্য গঙ্গা, যমুনার সাথে ঠিক মিশতে না পেরে সঙ্গমের মাঝে তৃতীয় একটি ধারার মত বয়ে চলেছে। সরস্বতী নদী অনেক আগেই যমুনার সাথে মিশে গেছে। যমুনার পাড় দিয়ে আধ মাইল হেঁটে গেলেই দেখা যাবে 'সরস্বতীকুণ্ড'। ওখানে কেউ যায় না। ঐ কুণ্ডেরই নীচে মাটির তলায় সরস্বতী মিশেছে যমুনার সাথে—এখানে নয়। আবার মনে হত—থাক্, এই করেই তো অনেকগুলো লোক সংসার চালাচ্ছে। নিজে বেকার বলে অপরের চাকুরীতে বাধা দেওয়া শুধু অন্যায়ই নয়, পাপ। এর চাইতে এই মজা দেখা অনেক ভাল।

কত বিচিত্র-ধরণের লোক আসছে রোজ এই এলাহাবাদে—এই প্রয়াগ-সঙ্গমে।

এলাহাবাদে এসে এই সঙ্গমে স্নান না করলে, এলাহাবাদ দেখা সার্থক হবে না। হাজার হাজার বছরের পুরানো মানুষের তীর্থক্ষেত্র এই 'প্রয়াগ-সঙ্গম'। আজও দেশের অধিকাংশ লোকের এই ধারণা।

কত কাহিনী, কত ঘটনা, কত কথা এর সাথে জড়িত। এতো আর হালে তৈরী নেহরু পরিবারের 'কমলা-ভবন' না। এ যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে বিজড়িত একটা নাম। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-সাবিত্রী থেকে আকবর বাদশা ইংরাজ আমল পর্যন্ত একই ধারায় প্রবাহিত। একই নামে চিহ্নিত—'প্রয়াগ-সঙ্গম'।

রাজাগোপালনের বেশ অবাক লাগে। সত্যিই তো কত বিদেশী ধকল গেছে এই ভারতের উপর দিয়ে। পাঠান, মোগল, ইংরাজ, আরও কত। কেউ তো এই 'প্রয়াগ-সঙ্গমের' নাম পালটে দিতে পারে নি। কেউ তো কোনদিন এর নাম পালটে—'বাদশাহ-মিলন,' বা 'টমসনস্ সিট' এ ধরণের নাম দিতে পারে নি। রাজত্ব তো ওদেরই হাতে ছিল। আমাদের কত কৃষ্টি, কত প্রাচীন

নিদর্শন নষ্ট করে দিয়েছে—এমন কি কত সহর, কত নগরের নাম পাল্‌টে অন্য নাম রেখেছে। কিন্তু একে কেন নিষ্কৃতি দিয়েছে!

এর নাম পাল্‌টাতে পারলে কত সহজে তাদের প্রচার বাড়ত। কত সহজে আরও অনেক বছর তাদের রাজত্বকালটা প্রসারিত করতে পারত।

রাজাগোপালনের সাগরগিরি যাবার কথা মনে পড়ে। এক নেহাতই সাধারণ চিম্‌টেধারী সাধু। রাজাগোপালন তাকে একদিন এই প্রশ্নই করেছিল। উত্তর শুনে রাজাগোপালন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক কোজাগোরী পূর্ণিমার দিন সরস্বতীকুণ্ডে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। সেদিন তাঁর শিষ্য-সামন্তরা অপেক্ষা করে এই কুণ্ডের পাড়ে যমুনা তটে। ঠিক ভোর ছ'টায় এসে হাজির হন তিনি। সেই শিষ্যদের মুখেই রাজাগোপালন জানতে পেরেছিল কে এই সাগর-গিরি-বাবা।

সেদিনও রাজাগোপালন এসে সরস্বতীকুণ্ডে বসেছিল। সে প্রায় বছর দুই'এর কথা। কুণ্ডের কাছে এসে সে চিনতে পারে নি। জায়গাটার একদম ভোল পাল্‌টে গিয়েছিল। অনেকগুলি লোক, ঘাটের পাণ্ডা বলেই মনে হল, দুই, একটি মাঝি মল্লারও ছিল, কুণ্ডের চার-পাশটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এদিকে যমুনার তট-টা বেশ উঁচু, পাহাড় পাহাড় মনে হয়। ঐ উঁচু জায়গা থেকে দুটো গাছের ডাল থেকে দড়ি টেনে ঠিক 'সরস্বতীকুণ্ডের' ওপর একটা সুন্দর চাঁদোয়া টাঙান হয়েছে।

দু-একজন পাণ্ডাগোছের লোক সবে স্নান সেরে ল্যাঙটি পরে কপালে চন্দনের তিলক কেটে চাঁদোয়ার নীচে বসে গম্ভীর মনোযোগ-সহকারে সিদ্ধি বাটছিল। একটা মাঝি সুন্দর একটা মাজা-ঘষা ঘটিতে দড়ি লাগিয়ে সরস্বতীকুণ্ড থেকে জল তুলে দিচ্ছিল। একটু দূরে আরেক জন একটা ছোট চৌকো কাঠের উপর ছুরি দিয়ে কি যেন কাটছিল। বোধহয় গাঁজার পাতা।

রাজাগোপালন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। বিশেষ করে পরম নিষ্ঠা সহ এই ভাঙ ছানা আর গাঁজা-কাটার ঘটনা। তার কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়েছিল। সমস্ত পরিবেশে কেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব। রাজাগোপালন তখনও ভাল হিন্দী শিখতে পারে নি। ভাঙা, ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেছিল,—কেয়া বাৎ ভাইয়া, হিয়াঁপর কেয়া হোগা। তারা সবাই রাজাগোপালনকে খুব আপ্যায়ন করেছিল।

—আইয়ে বাবু, বইঠিয়ে। এক বড়া মহাত্মা আয়েঙ্গা আজ। সাগর-গিরি-বাবা।

রাজাগোপালনের কৌতূহলে আরও সুড়সুড়ি পড়ে। সাগর-গিরির জন্য উৎসুক্য প্রকট হয়।

তাদেরই মুখে এই সাগর-গিরির যা পরিচয় পেল, তা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। তিনি নাকি কেদার বদ্রী দর্শন করে গোমুখী থেকে গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রতি বছর ঠিক 'সাগর মেলা'র দিন গঙ্গা সাগরে হাজির হন। সেখানে স্নান সেরে আবার গঙ্গার অপর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক সেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, যেদিন প্রথম কেদারনাথের মন্দির খোলে, সেদিন কেদারধামে গিয়ে উপস্থিত হন। গত ষাট বৎসর ধরে তিনি এটা করে আসছেন। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। ঝড়, বৃষ্টি-পাহাড়-পর্বত, বাঘ-ভাল্লুক—কোন কিছুকেই তিনি পরোয়া করেন না। এটাই যে তাঁর সাধনা। গঙ্গার দুই তীরের গ্রাম আর নগর সভ্যতা তাঁর নখ-দর্পণে। এমন মহাত্মা আর পণ্ডিত ব্যক্তি নাকি সমগ্র ভারতে বিরল।

রাজাগোপালন জিজ্ঞেস করেছিল— তাঁর পেট চলে কি করে?

তারা সবাই একসাথে বলেছিল,—তাদেরই মত বহু ভক্ত আছে তাঁর, গঙ্গার পাড়ে পাড়ে। যেদিন যেখানে হাজির হন, সেই ভক্তরাই তাঁর সেবা দিয়ে নিজেদের ধন্য করে। তাঁর সেবা করা

এক দুর্লভ সৌভাগ্য। প্রত্যেক বছর কোজাগরী পূর্নিমার দিনে তারা এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। সেদিনও যে ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা।

'জয় বাবা ভোলানাথ, শিব-শম্ভু।' এক মধুর কণ্ঠস্বরে রাজাগোপালন ফিরে তাকিয়েছিল। এক অতি সাধারণ চিম্‌টেধারী এক নেংটি পরা সাধুবাবা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলী। লম্বা লম্বা দাড়ি, দীর্ঘ জটা। সমস্ত শরীর ভস্মে ঢাকা।

বাবা আ গিয়া, বাবা আ গিয়া। সবাই উঠে গিয়ে সেই সাধুর পায়ের ধূলো নেয়।

সাধুর মুখটা রাজাগোপালনের বেশ ভাল লেগেছিল। সদাহাস্যময়। পথশ্রমের কোন ক্লান্তি নেই। গলার স্বরটাও বেশ মিষ্টি। গাঁজা খাওয়া কণ্ঠ নয়। হাসতে হাসতে—বলেছিলেন ব্যস্ ব্যস্ বহুত হুয়া। বাবার নাম লেও।

রাজাগোপালন কিন্তু তাঁকে দেখে ওঠে নি। লোকের কথায় তার বিশ্বাস কম। হাত তুলে নমস্কার বা প্রণাম জানান তো দূরের কথা।

সাধুবাবাই তাকে দেখে প্রথম কথা বলেন,—বাবু কেয়া মুঝেসে নারাজ হো। কেয়া সেবা কর সকৃতা হুঁ।

রাজাগোপালন এ রকম প্রশ্ন আশা করে নি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—নেহী, নারাজ কেঁই হুউঙ্গা। আপকা লিয়ে বৈঠা হ্যায়।

রাজাগোপালনের সাথে এই সাধুর অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। গঙ্গার তীরে তীরে বহু তীর্থের কথা। বহু স্থান-মাহাত্ম্যের উল্লেখ করেছিলেন সাগর-গিরি সেদিন। রাজাগোপালন সেদিন প্রথন জানতে পেরেছিল সোসাল-সাইন্সের কথা। আমরা তো জ্ঞানের উপর, থিওরির উপর ভিত্তি করে সোসাল সায়েন্সের বই

লিখি, য়্যুনিভার্সিটি পড়াই, কিন্তু এঁরা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রাণের মর্ম বেদনা দিয়ে সোস্যাল সায়েন্সের কথা বলেন। আমরা তা শুনি, উপেক্ষা করি। ভারতবর্ষের ইতিহাস এঁদের কথা বাদ দিয়েই রচিত হয়। এদের কথায় যে ভারতের শাশ্বত রূপটি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, কথায় যে শুধু ভারতেরই কৃষ্টি, সাধনার কথা ধ্বনিত হয়। এঁরা যে খাঁটি ভারতীয়, বিদেশী আচার আচরণের নাম গন্ধত এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা যে ভক্ত, এঁরা সে সাধু। এঁদের কথা বর্তমান জগতে অচল। বাবা সেবা তৈয়ার—একজন ভক্ত এক গ্লাস ভাঙের সরবৎ সাধুবাবার হাতে দেয়।

তিনি পরমানন্দে তা গ্রহণ করেন।

জয় বাবা ভোলানাথ।

সবাই একসাথে চেঁচিয়ে ওঠে।

এর পরের ঘটনার জন্য রাজাগোপালন প্রস্তুত ছিলনা। ভক্তরা বাবার হাতে গাঁজার কোল্কে তুলে দিতেই, সাধুবাবা পরম অগ্রহে তা নিয়ে, কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বললেন,

বাবা ভোলে চেলে, তেরে নামকে মেলে।

এর পরই দিলেন এক লম্বা টান। মুখ দিয়ে কোন ধুঁয়ো বেরোল না। এমন কি কলকেটির উপর দিয়েও না। বাবা বাঁ হাতের তালু দিয়ে সেটা চেপে রেখেছিলেন। গাঁজার ধুয়ো নষ্ট হওয়া মহাপাপ। বিশ্বনাথ রাগ করেন—গাঁজার অবমাননা হচ্ছে বলে।

পর পর সব ভক্তরা একটি করে টান মেরে সর্বশেষে রাজা-গোপালনের দিকে অম্লান বদনে বাড়িয়ে দিল কল্কেটা। রাজাগোপালন প্রথমে বুঝতে পারে নি, কি করতে হবে। একজন বলে দিল। লেও বাবাকা প্রসাদ। রাজাগেপোলন বলেছিল—সে গাঁজা খায় না। তারা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল এ কথায় তবে কেন বাবা এখানে এসে বসা।

রাজাগোপালন দেখেছিল সাধুবাবা তার দিকে তাকিয়ে মুচ্কি হাস্ছিলেন।

এরপরই রাজাগোপালন সাগর-গিরিকে সেই প্রশ্ন করেছিল। ভারতের উপর এত আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়াগ-সঙ্গমের নামটা পালটায় নি কেন ?

সাধুবাবা বলেছিলেন—কোটি কোটি বিশ্বাসী মনের জোরে এ নাম আজও টিকে আছে। এই বিশ্বাসী মনের কাছে শুধু মোঘল, ইংরাজ কেন খোদ ঈশ্বরও অসহায়। যতদিন বিশ্বাস আছে ততদিন এ নাম আছে। যেদিন বিশ্বাস টুটবে সেদিন এ নামের মোহও ভাঙবে।

তারপর একটু হেসে বলেছিল—বাবু আপনাদের শিক্ষাই একমাত্র এ বিশ্বাসকে ভাঙতে পারে। দিন আসছে যখন 'প্রয়াগ-সঙ্গমও' থাকবে না, এই 'সাগরগিরি'ও থাকবে না।

রাজাগোপালন একটু অবাক হয়েছিল—আপনার নামের সাথে প্রয়াগ সঙ্গমের কি সম্পর্ক ?

সাধু তেমনই মুচকি হাসি হেসে বলেছিলেন—অনেক সম্পর্ক বাবা, চিরকালের সম্পর্ক। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আমরা এ কাজ করে আসছি। কোনদিন আমাদের গুরুরও অভাব হয় নি, শিষ্যেরও কমতি ঘটে নি। যেদিন থেকে প্রয়াগ সঙ্গমের উৎপত্তি, সেদিন থেকে আমাদের স্থুরু। যেদিন প্রয়াগ-সঙ্গম থাকবে না সেদিন সাগরগিরিও থাকবে না।

এই যে ইউ আর রেডি ? কতক্ষণ এসেছ ? অর্দ্ধেন্দুর ডাকে রাজাগোপালনের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

অর্দ্ধেন্দু এবার একটু ঠেস দিয়ে বলে—আর ইনটারভ্যু দিয়ে কি হবে বাবা, লোটা কম্বল সম্বল করে বেরিয়ে পড়না ?

রাজাগোপালন একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলে—যেতাম, যদি তোমরা ভিক্ষে দিতে।

অর্দ্ধেন্দু একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে—সাধুবাবা হয়েই দেখ না, দেই কিনা ?

রাজাগোপালন দৃঢ় গলায় বলে—ইম্‌পসেবিল। তোমরা যে শিক্ষিত। ভিক্ষা দিতে হলে যে সর্ব-সত্ব ত্যাগ করে দিতে হয়, সে খেয়াল আছে ? ভিক্ষা দিতে যে বিশ্বাসের দরকার।

অর্দ্ধেন্দু রাজাগোলনের হাতটা ধরে বলে—থাক্ অনেক হয়েছে। বুঝেছি তুমি তৃতীয়মার্গে আছ। আপাততঃ এই অবলম্বনটি একমাত্র সম্বল করে চল দেখি। আটটা তিরিশে ট্রেন, খেয়াল আছে ?

অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালনের ইনটারভ্যু লেটারটা তার হাতে গুঁজে দেয়।

নয়

মিঃ কোহলী মুসৌরী থেকে একদিন আগেই ফিরেছিল। সকাল বেলায় মোটরের হর্ণে রহমান বুঝতে পেরেছিল সাহেব ফিরেছেন। দৌড়ে গিয়ে গেটটা খুলে দিয়েছিল। কোহলী ভেবেছিল বাগানেই নায়নাকে দেখতে পাবে। তার তো এটা একটা হ্যাবিট, খুব ভোরে উঠে বাগানের চর্চা করা। অথবা তার পেট জ্যাকিকে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া। কোহলী একটু দেরীতে ওঠে, আটটার আগে তো নয়ই। উঠে নায়নাকে দেখে মনে হত, তার যেন এক প্রহর বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। বাগান দেখা, জ্যাকিকে খাওয়ান এমন কি নিজের স্নানটা পর্যন্ত সারা হয়ে গেছে। স্নান সেরে এলোচুলে নায়নাকে বাগানের কাজে মগ্ন দেখতে ভারি ভাল লাগে। খুব বাঙ্গালী বাঙ্গালী মনে হয়। ইভামাসির প্রভাবটা তার মধ্যে প্রচুর। কোহলীর অনেকদিন মনে হয়েছে—কেন মিস্টার আর মিসেস টেলর তাকে বাঙ্গালী ধাতে গড়ে তুলেছেন। কখনও মনে হয়েছে—

তাতে কি, তারও শরীরে তো পাঞ্জাবী রক্ত আছে। ভালই হয়েছে, নায়নার প্রভাবে পাঞ্জাবী দ্বারা বাংলাটা শিখেছে মন্দ নয়। চাকুরীক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। বিশেষ করে কখনও যদি বেঙ্গলে পোস্টেড হয়!

বাঙ্গালী মেয়েদের সকালে এলোচুলে দেখতে যেমন মিষ্টি লাগে, তেমনই তাদের চেসটিটি বজায় রাখার অহেতুক প্রচেষ্টাটা কোহলীর অসহনীয় মনে হয়। নায়নারও সে রোগ আছে। আজ পর্যন্ত মদ স্পর্শ করল না। কোন পার্টিতে গিয়ে কারুর নাচের সাথী হল না। একদিন তো এ নিয়ে কমিশনার মিঃ মেহতা কোহলীকে দুকথা শুনিয়েই দিলেন।

ইওর ওয়াইফ ইজ ভেরী কনসারভেটিভ মিঃ কোহলী। ইজ সি নট এ কৃশ্চিয়ান গার্ল?

উঃ সে কি লজ্জা! মিঃ কোহলীর সেদিন খুব রাগ হয়েছিল নায়নার উপর।

গত তিন দিন মুসৌরীতে খুব খাটনী গেছে মিঃ কোহলীর।

সকালে এসে অন্ততঃ স্বামীগতা-প্রাণ স্ত্রীর মুখটা প্রথমেই দেখবে ভেবেছিল। নায়নাকে না দেখতে পেয়ে একটু অসন্তুষ্ট হয় কোহলী। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও বেরোল না। রহমনকে জিজ্ঞেস করে—

মেম-সাব কাঁহা?

মেমসাব কা নিদ্ আভিতক.নহি টুটা সাব।

নায়না এখনও ঘুমোচ্ছে। মিঃকোহলী রিস্টওয়াচের দিকে তাকায়। সকাল সাতটা। সকাল সাতটা! এখনও নায়না জাগে নি। অসুখ করে নিতো! মিঃ কোহলী চিন্তিত হয়ে পড়েন। ছুটে যান নায়নার শোবার ঘরের দিকে। লন পেরিয়ে আউট হাউজের উল্টোদিকে নায়নার ঘর। ভিতর দিকে না ঢুকলে বাইরে থেকে দেখা যায় না। মিঃ কোহলী জানলার দিকে তাকাতেই বিস্মিত

হন। নায়নার ঘরে এখনও লাইট জ্বলছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন জানলার কাছে। একি! ফ্যানও ঘুরছে ফুলস্পীডে। ঐযে নায়না খাটের উপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। নায়নার একি অবস্থা! বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে মিঃ কোহলীর। ইজ ইট সুইসাইড অর মারডার! না তেমন কিছু না। নায়না ঘুমোচ্ছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ব্লাউজ ঢাকা বুকটা খুব ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। শাড়িটা তখনও ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। মিঃ কোহলী বুঝতে পারে না নায়নার কি হয়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল আলমারিটা খোলা। ড্রিংকের বোতলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ইয়েস, নায়না ইজ ড্রাংকেন। ঐতো হুইস্কির বোতলটা মাটিতে পড়ে। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। খাটের তল থেকে জ্যাকি বেরিয়ে এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে থাকে। জ্যাকির গায়েও গন্ধ। বোধহয় বোতলের বাকি অংশটুকু চেটে পুটে সাবাড় করে দিয়েছে।

নায়না মদ খেয়েছে? কিন্তু কেন? কোহলী বুঝতে পারে না। মিঃ কোহলীর সন্দেহ ঘনীভূত হয়। দেয়ার ইজ সাম মিস্ট্রি ইন ইট।

কোহলী নায়নাকে না জাগিয়ে চলে যায় সোজা বাথরুমে।

তাড়াতাড়ি ব্রেক-ফাষ্ট করে মিঃ কোহলী বেরিয়ে যান কাজে। যাবার সময় রহমানকে বলেছিল—মেমসাহেবের শরীর খারাপ, তাকে যেন ডিসটারব্ না করা হয়

গাড়িতে চড়ে মিঃ কোহলী ষ্টারট্ দিয়ে আবার থেমে যান। কিছুক্ষণ ভাবেন। রহমানকে এ প্রশ্ন করবে কিনা।

নো, রহমান মাষ্ট নট টেল এ লাই। অনেকদিনের পুরোনো লোক।

মিঃ কোহলী ডাকেন—রহমান।

জী, হুজুর।

কাল যব মেম সাব ঘর লোটা, কই থা উনকী সাথ ?

নেহী হুজুর।

ঝুট্ মাত বোল রহমান! কোহলী দাঁতে দাঁত চাপে।

আল্লাকা কসম্ হুঁজুর, কৈ নহী থা। রহমান একটু দম নিয়ে বলে মগর—

মগর-কেয়া ? মিঃ কোহলীর কণ্ঠস্বরে রীতিমত ধমকের সুর।

মগর সাব, মেমসাহাব রাতকো বহত হাসতি থী।

কিত্‌না বাজে ?

করিব করিব রাতকা তিন বাজে।

মিঃ কোহলীর ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে পড়ে।

কৈ বাদ চিত শুনা ?

হ্যাঁ, সাব, মাইজী শান্তনু, শান্তনু বলকে চিল্‌লা রহী থী।

ঠিক হায় তোম যা সকৃতা।

মিঃ কোহলী দ্রুত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নায়নার ঘুম ভেঙেছিল অনেক দেরীতে। তখনও নেশার ঘোর কাটে নি চোখে আড়ষ্টভাব, শরীরে দুর্বলতা। ধড়মড় করে উঠে বসে নায়না। প্রথমেই ঘড়ির দিকে তাকায়। ইস্ দশটা বাজে। এত দেরী তার কোনদিন হয় নি। লাইটটা জ্বলছে কেন। ফ্যানটাও তো ঘুরছে। কাল রাতে কি এগুলো নিবোতে ভুলে গিয়েছিল নাকি ? তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে লাইট, ফ্যান নিবিয়ে দেয় নায়না। পা টা ভীষণ ভার ভার ঠেকছে, কি হয়েছে তার ? কাল রাতে কিছু হয়েছিল নাকি ? নায়না ঠিক স্মরণ করতে পারে না। হঠাৎ নজর পড়ল আলমারিটা খোলা। আস্তে আস্তে স্মৃতিপটে সবই একের পর এক উদিত হতে থাকে। কাল রাতে সে ড্রিংক করেছে। রাগে ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর জ্বলতে থাকে। একি করেছে সে। কতটা ড্রিংক করেছে সে ? ঐতো বোতলটা মাটিতে গড়াগড়ি

যাচ্ছে। সে কি মাতাল হয়েছিল নাকি? ভারি লজ্জা পায় নায়না মনে মনে। ভাগ্যিস্ কোহলী ফেরে নি। কি ভাবত তাকে। নায়না সোজা চলে যায় স্নানের ঘরে। স্নান সেরে খোলা চুলে গিয়ে দাঁড়াল বাগানে। শরীরটা এখন বেশ হালকা লাগছে।

ইভামাসি বলতেন—সকালে উঠে বাসি-কাপড় ছেড়ে স্নান সেরে আসা হিন্দু মেয়েদের প্রত্যহ একটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাতে শরীর মন সুস্থ থাকে। নায়না প্রতিবাদের সুরে বলত—আর কৃশ্চিয়ান মেয়েদের বুঝি তা করলে দোষ হয়।

মাঝখানে শান্তনু খোটা দিত। বলত—ক্রিশ্চিয়ান মেয়েরা তো অনেক এ্যাড্ভান্সড্। দে ডোন্ট বিলিভ ইন দিস নেটিভ কালচার।

নায়নার খুব হাসি পেল কালরাতের ঘটনা ভেবে। শান্তনুর সাথে দেখা হলে তাকে জানিয়ে দেবে—ক্রিশ্চিয়ান গার্লস ক্যান নট ওনলী ফরগেট নেটিভ কালচার, বাট ক্যান অলসো ইগ্নোর ইট্।

নায়না অন্যান্য দিনের মত ফুলের টবগুলোর তদারক করতে লাগল। জ্যাকিটা এসে বার বার তার গায়ে লাফিয়ে উঠছে কেন? তাইতো অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, জ্যাকিকে এখনও খাবার দেওয়া হয় নি!

নায়না তাড়াতাড়ি ছুটল রান্নাঘরের দিকে। জ্যাকির রোজকার বরাদ্দ স্টু‌টা হয়েছে কিনা দেখতে।

ব্রেক-ফাস্ট, মেমসাব?

রহমনের কণ্ঠে নায়না বাধা পায়।

লনে টেবিলটার উপর ট্রেটা রেখে দাও রহমন।

জ্যাকিকা খানা হাম লিয়া আয়া, মেমসাব।

তোম লিয়া আয়া, কেঁউ? নায়না বিস্মিত হয়।

রহমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নায়নার মনে পড়ল রোজই তো রহমন জ্যাকির খাবার তার ব্রেক-ফাস্টের সাথে নিয়ে আসে। এটা তো নায়নারই আদেশ।

ঠিক হ্যায়, তোম যাও রহমান।

রহমন একটা সেলাম ঠুকে চলে যায়।

দুপুর গড়িয়ে বেলা গেল বিকেল এল। নায়নার তখনও শরীরটা পুরো সারে নি। চুল বাঁধতে গিয়ে চোখের কোলে কালির দাগ স্পষ্ট দেখতে পেল। কাল রাতের ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কোহলী ফিরেছে। এ হর্নের শব্দ নায়না জানে। একদিন আগেই এসে গেছে। খুব ভাল লাগল নায়নার। আজ রাতটা কি করে কাটবে এতক্ষণ সেই চিন্তাই হচ্ছিল। কোহলীকে খুব ভাল লাগে। নায়নার কথা ভেবেই নিশ্চয় টুর-কাট করে চলে এসেছে। কোহলীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নায়নার মন ভরে ওঠে। কোহলী ইজ টু গ্রেট। কোহলীকে সে বলবে—সে ড্রিংক করেছে। হ্যাঁ সে ড্রিংক করেছে। নট টু ফরগেট, বাট টু কিপ দি চেস্টিটি অব এ কৃশ্চিয়ান গার্ল। কোহলী নিশ্চয় তাকে কনগ্রেচুলেট করবে। নায়না একটা রবীন্দ্রনাথের সুর গুন, গুন করে গাইতে গাইতে দ্রুত-লয়ে গেটের দিকে ছুটে গেল। না, না, আর রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়—ইট মাস্ট বি. এ. কৃশ্চিয়ান সংগ। নায়না গুন গুন করে গায়—আই ক্যান নেভার ফরগেট ইউ, ডারলিং।

নায়না ভুলেই গিয়েছিল তার পরনে তখন গাউন নয়, শাড়ি, খোলা চুল, কপালে টিপ হাতে যশোরের বড় চিরুণী। নায়না দৌড়ে গেল মোটরের কাছে—গুড্ ইভনিং ডারলিং। আমি জানতাম তুমি আসবে। ইউ কান্ট লীভ মি এলোন? তোমাকে যে আমার এখন সবচেয়ে বেশী দরকার।

রহমান মিঃ কোহলীকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করছে। রহমানের একটা কাঁধে মিঃ কোহলীর হাত। আরেকটা হাতে গাড়ির স্টেয়ারিংটা ধরে ঠিক ছাড়তে পারছে না। কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। চুল উস্কো-খুস্কো। টাইটা লুজ বাড়ি ফেরার সময় মিঃ কোহলীকে নায়না কোনদিন এ রকম দেখে নি। হি ইজ এভার এ কেয়ারফুল ম্যান। হি ইজ এভার গ্রীন।

নায়না শঙ্কিত হয়—মুসৌরীতে গিয়ে শরীর খারাপ হল নাকি?

আই এ্যম কোয়াইট অল রাইট।

থ্যান্‌ক ইউ নায়না। মিঃ কোহলী জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন কথাগুলো।

একি, কোহলী মাতাল হয়ে ফিরেছে। হি ইজ হেভিলী ড্রাংকেন। এমন তো হবার কথা নয়। কোহলী কখনও মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে নি। কি হয়েছে তার? নায়না গিয়ে তাড়াতাড়ি রহমনের হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে কোহলীকে মোটর থেকে নামতে সাহায্য করে।

হোয়াটস্ রঙ্ উইথ ইউ কোহলী? কি হয়েছে তোমার? নায়নার প্রশ্নে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট।

ডোন্‌ট ইউ নো? কোহলীর কণ্ঠে ধমকের সুর।

নায়না বিস্মিত হয় এ কণ্ঠস্বরে। নায়না একবার একটু হাসে, ও বুঝেছি, তোমায় রিসিভ করতে এয়ার-পোর্টে যাই নি বুঝি? তা আমার কি দোষ বল? তুমি একদিন আগেই চলে আসবে— তা কেমন করে জানব? টেলি বা চিঠি কিছুই তো দাও নি।

তারপর একটু ছেলেমানুষী করেই বলে—সে বুঝি এ জন্য ছেলেমানুষী করেছ। এয়ার-পোর্টে বসে এক গাদা গিলেছ। জাসট্ টু ফরগেট মি।

মিঃ কোহলীর তখন খুন চেপেছে—সাট-আপ, ডোনট-টক ননসেনস্।

নায়নার হাত থেকে চিরুণী খসে পড়ে। নায়না স্তম্ভিত হয়ে যায় কোহলীর এ ব্যবহারে। নীচু হয়ে চিরুণীটা তুলে নেয়। একটু আশ্বস্ত হয় নায়না। কোহলী কতদিন বলেছে, বিকেলে অন্ততঃ গাউনটা পোরো। সকালে শাড়ি পড়লে আমার আপত্তি থাকে না। নেহাত মন্দ লাগে না ঐ সাজে তোমায় দেখতে।

নায়না একটু ভর্ৎসনার সুরে বলে—ইস্, খবর দিয়েছিলে তুমি আসছ? তাহলে তোমার মন মত ড্রেসটা পরতাম।

এটা পরেছ কার জন্য? ড্রইং রুমের দরজার কাছে এসেই কোহলী নায়নার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, সোজা সোফায় গিয়ে বসল।

নায়নার কোন উত্তর না পেয়ে কড়া মেজাজে বলে, আই মীন ইউ নায়না, হোয়াই হ্যাব ইউ পুট-অন দিজ ড্রেস? ফর হুম ইট ইজ মেণ্ট? কোহলীর সুরে রীতিমত উষ্মা। মাতালের মত জড়ান নয়।

নায়না কিছুই বুঝতে পারে না। কোহলী তো কোনদিন এমন ব্যবহার করে না। বেশী ড্রিংক করলেও না।

কোহলীর কথারও সে কোনদিন অবহেলা করে নি। বিকেলে তার বন্ধু-বান্ধবরা আসত বলে গাউনটাই পরত। পার্টিতে, ডিনার টেবিলে কখনও কোহলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে নি। দুই একটি বিশেষ জায়গা ছাড়া। ড্রিংক সে কোনদিনই করে নি। আরেকটা কথা—উঃ, সে কথা ভাবতে এখনও তার ভয় করে। ভীষণ-লজ্জা করে, খুব কষ্ট হয়, দারুণ অপমান বোধ হয়। সে কথা বলার নয়। কোহলীর সে কথা সে কোনদিনই রাখতে পারবে না, রাখা সম্ভব নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোহলীর বস কমিশনার মিঃ মেহটার সাথে কাটান। পারলে তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। না, সে কখনই এ কাজ করতে পারবে না।

কোহলীর চোখ বাঘের হিংস্রতায় নায়নার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকে। নায়নাকে ভাবতে দেখে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

কি, উত্তর খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি? আর ইউ ট্রায়িং টু ইনভেণ্ট সাম আনসার?

এবার নায়নার রাগ হয়। কোহলী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তোমার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর ছিল। তাই দেবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

সাট আপ, ডোন্‌ট ট্রাই টু শীল্‌ড ইওরসেল্‌ফ।

নায়না এইটু ভয় পায়। কোহলী তো কোনদিন এমন করে না। ওর মুখের দিকে তাকান যাচ্ছে না। বন্য হিংস্রতার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ড্রিংক করার পর তাকে আরও অনেকবার হিংস্র হতে দেখেছে নায়না। সে হিংস্রতায় ছিল কামনার উন্মত্ততা। এর সাথে অনেক পার্থক্য তার। এখানে প্রতিশোধের নেশা। নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত করে বলে—উত্তরটা তো তুমি ভাল করেই জান। গাউনটা পরি তোমার জন্য, আর এটা আমার জন্য। ইট ইজ ওনলী মেণ্ট ফর মি।

ডোন্‌ট টেল এ লাই? কোহলী দাঁত কামড়াতে থাকে।

নায়না দৃঢ় গলায় বলে—মিথ্যা কথা বলতে আমি ঘৃণা করি।

এবার কোহলী হাঃ, হাঃ করে হেসে ওঠে। রহমন দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সাহেবের এ হাসিতে তারও কেমন ভয় হল। দরজা থেকে সরে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। চলে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু সাহেবের হুকুম—আরে আমার সতীসাধ্বী স্ত্রীরে; কোথায় ছিল এ সতীত্ব এতদিন? দেখবে মিথ্যা বল কিনা? আই ক্যান প্রুভ ইট জাস্‌ট নাউ।

মিঃ কোহলী গলাটা একটু নামিয়ে দেওয়ালের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলে—দেখেছ ওটা কি?

নায়না ভীত নয়নে তাকায় সেদিকে। শঙ্কর মাছের চাবুক।

কোহলী চকিতে পিছন ফিরে আবার পিছনের দিকে তর্জনী

নির্দেশ করে—এটা? নায়না সেদিকে তাকায়—তলোয়ার। কোহলীদের সাতপুরুষের বীরত্বের নিদর্শন।

আই. এ. এস ট্রেনিং প্রাপ্ত কোহলী মুহূর্তে মদের নেশা ভুলে উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। গলার টাইটা ঠিক করতে করতে বলে,—

ওটা?

দেওয়ালের খুব উঁচুতে টাঙান একটা রাইফেল।

নায়না আস্তে আস্তে চোখ ওঠায়।

এখনও বলবে তুমি মিথ্যা বল না?

কোহলী কোমরের বেলটা ঠিক করতে করতে নায়নার দিকে এগিয়ে যায়।

এখনও বল, ফর হুম ইট ইজ মেণ্ট?

নায়নার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। এরকম কোহলীর সাথে তার কোন দিন পরিচয় হয় নি। সে বুঝতে পারে না কি বললে কোহলী সন্তুষ্ট হবে। তার ভীষণ লজ্জা করছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে রহমন সব দেখছে।

কোহলীকে সংযত করতে কৃত্রিম অনুনয়ের সুরে বলে—

বলব সব বলব। তোমায় না বলে পারি? চল, আগে ডিনার শেষ করে নাও। তারপর সব হবে। রেস্‌ট অব দি নাইট ইজ ফর ইউ এণ্ড মি।

কোহলীর মুখের হিংস্রতা একটু কমল না। বরং বাড়ল।

আই থিঙ্ক ইউ আর ফ্রাইটেন্‌ড। মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ? ইয়েস আই ক্যান সেভ ইউ। প্লীজ টেল মি হুম ইট ইজ মেণ্ট ফর?

নায়না এবার আহত সর্পের মত গর্জে ওঠে—বললাম তো আমার জন্য।

ওঃ আই এ্যম মিস্‌টেক্‌ন। তুমি দেখছি ভয় পাও নি। অল রাইট।

কোহলী দ্রুত পায়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে এক টানে

চাবুকটা নিয়ে আসে। সপাং করে একটা শব্দ হল। জ্যাকি এতক্ষণ নায়নার পায়ে মুখ ঘষছিল। দৌড়ে সোফার তলায় গিয়ে ঢুকল।

ক্রুর হাসি হেসে কোহলী বলল—দেখলে এটা কেমন কথা বলে? ইট ক্যান মেক আদারস টক টু! বল কার জন্য পরেছ এ পোষাক?

নায়না কথা বলতে পারে না। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে কোহলীর দিকে।

বলবে না?

নায়না তথাপি নিরুত্তর।

সপাং, এবার চাবুকের শব্দে বাইরে রহমনেরও ভয় হয়।

কোহলী! নায়নার কণ্ঠে আহত কণ্ঠস্বর।

আরেক ঘা বসাতে উদ্যত ডেপুটি কমিশনার জওহর কোহলীর হাতও থেমে যায়।

কোহলী তুমি আমায় মারলে? ইট ইজ নট ক্রিশ্চিয়ান কালচার টু হুইপ এ ডিফেণ্ডলেস্ ওয়াইফ।

কোহলীর হাত ক্ষণিকের জন্য থেমে যায়। সাথে সাথে বলে—ইট ইজ নো ক্রিশ্চিয়ান কালচার টু চিট এ ফেথফুল হাসবেণ্ড।

নায়নার মুখে এবার বেদনার সুর—আমি তো তোমায় কোনদিন চিট করি নি কোহলী।

কোহলীর রাগ তখনও কমে নি—একসেপট্ টু ডে। তারপর দাঁত কড়মড় করে বলে—

টেল মি হোয়াই ডিড্ ইউ ড্রিংক লাস্ট নাইট?

নায়না চমকে যায় এ প্রশ্নে। কোহলীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে তা এড়াতে পারে নি। নায়না ভাবে কোহলী কি করে জানল সে কথা। ও তো সন্ধ্যায় ফিরেছে। না, মিথ্যা কথা সে বলতে

পারবে না। চাবুকের ঘায়ে পিঠটা তার তখনও জ্বালা করছে। বোধহয় কেটে গেছে।

নায়না হাসবার চেষ্টা করে—তুমিই না বলেছিলে, এ কৃশ্চিয়ান গার্ল হ্যাজ নো চেস্টিটি উইথ আউট ড্রিংকস্।

তাহলে তুমি সত্যিই ড্রিংক করেছিলে?

হ্যাঁ!

বাট হোয়াই?

জাস্ট টু ফরগেট।

সপাং—কোহলী স্থির থাকতে পারে না। আরেক ঘা চাবুক বসিয়ে দেয় নায়নার পিঠে।

এগেন লাই। আবার মিথ্যে কথা। ইউ ড্র্যাংগ জাস্ট টু লুজ ইওর চেস্টিটি। ইয়েস টু লুজ ইওর চেসটিটি।

নায়না কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে,—

নো, নো, কোহলী। আমায় বিশ্বাস কর। স্রেফ ভুলবার জন্য ড্রিংক করেছি।

হঠাৎ কোহলীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তার সমস্ত মুখের চেহারাও পাল্টে যায়। অনুতপ্ত কণ্ঠে নায়নাকে বলে—

দেখ নায়না, ড্রিংক করায় আমি কিছু মনে করি না। ইট ইজ এ ভেরি গুড হ্যাবিট। তুমি জান ইট গিভস্ প্লেজার। কতদিন তোমায় এ কথা বলেছি। সত্যি বলতো এবার, প্লীজ ডারলিং—তুমি ড্রিংক করেছিলে ফর প্লেজার অর টু ফরগেট?

নায়না অবাক হয়ে যায় কোহলীর এ পরিবর্তনে। একটু ভরসাও পায়। আস্তে আস্তে বলে—

সত্যি বলছি শুধু নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য আমি ড্রিংক করেছিলাম।

কাউয়ার্ড—কোহলীর মুখে এবার ঘৃণার আবির্ভাব। তুমি এই সাধারণ কথাটা স্বীকার করতে পারছ না নায়না, তুমি ওনলী ফর

প্লেজার ড্রিংক করেছ। তুমি একা নও। প্লেজার কখনও একা হয় না। দুজন লাগে। হ্যাঁ দু-জন।

নায়না বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে কোহলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোহলী একটু হাসতে হাসতে বলে—

ঐ দেখ, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ। যেন কিছুই জান না। আই ডোনট্ মাইণ্ড ফর দ্যাট। এ ওয়াইফ অব এন অফিসার হ্যাজ গট দ্যাট লিবার্টি। একটু স্ফুর্তি, আমোদ আহলাদ নিশ্চয় করবে। কি বল, তাই না?

গলাটা নামিয়ে কোহলী এবার অনুযোগের সুরে বলে—

আচ্ছা কাল তুমি আর শান্তনু ড্রিংক করেছ, একটু আনন্দ করেছ—আই মীন, ইউ ডিড অল দ্যাট ফর প্লেজারস্ সেক। দ্যাটস্ রাইট। ইভেন ইউ মে স্পেনড্ এ নাইট উইথ হিম। অব কোর্স হোয়েন আই এ্যম আউট অব স্টেসন। আমি তাতে কিছু মনে করি না নায়না। আমরা কি বলি জান? উই মাস্ট সেয়ার আওয়ার প্লেজার উইথ মেনি। ঐ একজনেই আমার আপত্তি। নেকস্ট ডে ইউ মাস্ট সেয়ার ইওর প্লেজার উইথ মিঃ মেহটা। আই এ্যাম সো সরি হুইপ্ ইউ, নায়না।

কোহলী নায়নাকে কাছে টেনে নেয়।

কোহলী কি বলছে নায়না ঠিক বুঝতে পারেনি। শান্তনু কথাটা কানে যেতেই তার মনে হচ্ছিল কে যেন তার কানে গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছে। খেয়াল হল মিঃ মেহটার নামটা শুনে।

নায়না ঘৃণায় কোহলীর হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

শান্তনুর নামে অযথা অপবাদ দিও না। তুমি আমাকে হুইপ কর গুলি কর, কিছু বলব না। আই ওয়ারন ইউ কোহলী। শান্তনুকে এর মধ্যে জড়িও না।

কোহলী বাঁকা হাসি হাসে—এ যে দেখছি প্লাটোনিক

লভ। ভেরি ইন্‌টারেসটিং। একেবারে হিন্দু ঘরের সতী নারী। তাহলে তুমি মিঃ মেহটাকে এনটারটেন করবে না?

না।—নায়নার দৃঢ় উত্তর

শান্তনুকে করেছিলে কেন?

করিনি।

আবার মিথ্যে কথা। আই ক্যান নট টলারেট টু থিঙ্গিস্‌। লভ, এণ্ড হিপোক্রেসি। বল, কেন তুমি কাল শান্তনুর সাথে কাটিয়েছ?

শান্তনু এখানে আসে নি—নায়নার কণ্ঠ অবিচল।

শুধু আসাই নয়, হি স্লেপ্ট উইথ ইউ ষ্টিল মর্নিং।

নায়না আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে—না, না। মিথ্যে কথা সব মিথ্যে।

কোহলীর মাথায় তখন খুন চেপেছে। শক্ত করে চাবুকটা ধরে বলে—এ্যন ইয়ঙ্গ লেডী হ্যাজ টু পে ফর হার লভ। এণ্ড হিয়ার ইট ইজ।

সপাং, সপাং—

উঃ, মাগো। নায়না হাত তুলে বাধা দেয়। কোহলী তখনও মেরে চলেছে। নায়না আর দাঁড়াতে পারে না। মনে হচ্ছে এখনি পড়ে যাবে। নায়না দৌড়ে বাইরে যায়। সেখানেও বাধা, রহমন দাঁড়িয়ে।

সাব বহুত হো গিয়া।

কোহলী চাবুকটা ফেলে দেয়।

রহমন!

সাব।

ডিনার লেয়া আও। আউর শুনো রহমন।

রহমন ফিরে দাঁড়ায় হুকুমের প্রতীক্ষায়।

মেমসাবকা যাঁহা যাঁহা পর লাগা, দাওয়াই লাগা দেও।

জী হুঁজুর।

নায়নার জন্য কোন বেদনা কোন সহানুভূতি রহমনের মনে সাড়া দিয়েছিল কিনা, তার কোন চিহ্ন তার মুখে দেখা যায় নি।

দশ

রাত তখন বারটা। শান্তনু তার ক্যান্টনমেণ্টের ফ্লাটের একটা ঘরে অরফেন হোম সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর্টিকেলটা লিখতে ব্যস্ত। গভীর মনোযোগ। শকুন্তলার কথা তাকে লিখতেই হবে। সারা ভারতবর্ষে কটা মেয়ে আছে শকুন্তলার মত। তার কথা অবশ্যই লিখতে হবে। আজ বিকেলেই সে জোর করে শান্তনুকে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইশপস্ অরফেন হোমে। আজ থেকেই সে গভরনেসের চাকুরীটা স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। ফিমেল ব্লকের এমিলি, লিসা, অতসী, বনলতা সবার সাথে আলাপ করেছে।

কি দরদী মন। গভীর কৃতজ্ঞতায় শান্তনুর মন ভরে ওঠে, না, শকুন্তলাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হবে। মাইনা তো বেশী দিতে পারবে না।

তিনশো ছেলেমেয়ের পিছনে যেখানে মাসিক চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচা, সেখানে ডোনেসন্ থেকে আয় মাত্র দু-তিন হাজার। বাকিটা শান্তনুকেই পুষিয়ে দিতে হয়। শান্তনু অনেকদিন ভেবেছে ডি. এস-সি. টা পেয়েই সে একদিন অনেক জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গিয়ে ইভামাসিকে অবাক করে দেবে। হ্যাঁ নায়নার জন্যও একটা প্রেজেন্ট নিয়ে যাবে নিশ্চয়। নায়না, ইভামাসি সকলের কথা সে ভাবে বটে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ফার্ষ্ট অরফেন হোমের ছেলেমেয়ে দেন আদার্স। তাতে ইভামাসি বা নায়না যদি মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তার কোন হাত নেই।

ইভামাসির টাকার অভাব নেই। আর নায়নারা তো রীতিমত বড়লোক। শান্তনুর মনে হচ্ছিল তার ডি. এস-সি ডিগ্রি অনেক উপকার করেছে। সবেমাত্র তিনদিন হল সে ডি. এস-সি পেয়েছে এরই মধ্যে কত কনগ্রাচুলেসন লেটার, কত প্রশংসা, কত সমর্থন জানিয়েছে কত লোক তার কাজে। এবার বোধহয় অদৃষ্ট…… ফিরবে। অরফেন হোমের ডোনেসনটা বাড়তে পারে। তখন সে একদিন যাবে ইভামাসির বাড়ি।

শান্তনু গভীর মনোযোগ সহকারে লিখতে থাকে। শকুন্তলা বলেছে অনেক লোক তার আর্টিকেল পড়বে। অনেক লোকের ভুল ভাঙবে। অরফেন হোম আর ডার্টি-প্লেস থাকবে না। স্বর্গে পরিণত হবে। লোকে জানবে অরফেন হোমে যারা থাকে, তারাও মানুষ। শিক্ষা-দীক্ষা পেলে তারাও বড় হতে পারে। নাই বা থাকলো তাদের হেরিডিটি। হেরিডিটি মানুষের একটা ফলস্ ভ্যানেটি। আসলে চেষ্টাই সব। চেষ্টা থাকলে মানুষ সব করতে পারে। তার প্রমাণ তো শান্তনু নিজে। তার কোন্ হেরিডিটি ছিল ইভামাসি কোন দিন বলেন নি। তার বাবা, মার নাম শান্তনু আজও জানে না। এ নিয়ে নায়না ছোটবেলার তাকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। অবশ্য পরে তা করে নি। এজন্য শান্তনু নায়নাকে দোষ দেয় না। ছোটবেলায় অনেকেই ওরকম করে। কিন্তু চেষ্টা থাকলে সব হয়, এটা শান্তনু সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়। চেষ্টা থাকলে অমানুষকে মানুষ করা যায়, পিতৃমাতৃহীনকে পিতামাতা করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা যেকোন এচিভ্মেণ্ট করতলগত করা যায়। শান্তনু তাই করে দেখাবে। শকুন্তলা হবে তার শক্তি তার প্রেরণার উৎস। নায়না নিশ্চয় আর্টিকেলটা পড়বে। বেশ একটা আত্মতৃপ্তি পায় শান্তনু। নায়না দেখুক তারই মত শিক্ষিত বিদুষী শান্তনুর কাজে কেমন সমর্থন জানিয়েছে। শুধু সমর্থনই নয়, নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করেছে।

শান্তনুর কলম দ্রুত চলতে থাকে।

শান্তনু!...

এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে শান্তনুর গভীর মনোযোগ ভঙ্গ হয়। কলম থেমে যায়, মন ধাবিত হয় সেই শব্দের দিকে, কান উৎকর্ণ হয় আবার শোনবার জন্য। হৃদয় উদ্বেলিত হয় কাছে পাবার জন্য। খুবই বেদনার্ত, আহত এ কণ্ঠস্বর। শোকে দুঃখে কাতর। শান্তনুর খুবই পরিচিত। এ যে নায়নার কণ্ঠস্বর। শান্তনুর নিজেরই হাসি পায়, বোধহয় একটু লজ্জাও। নায়নার কথা ভেবেই তার অমন হয়েছে! এতরাত্রে নায়না কোথা থেকে আসবে! আর তার বাড়ীই বা চিন্‌বে কেমন করে। শান্তনু আবার লেখায় মনোনিবেশ করে।

শান্তনু!—

আবার সেই কণ্ঠস্বর। এবার খুব কাছে জানালার ধারে। শীতকাল বলে জানালাটা বন্ধ ছিল। এবার কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট, আরও তীব্র আরও আর্ত। আরও করুণ। শান্তনু আর স্থির থাকতে পারে না। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলল।

কে?

শান্তনু আমি।

নায়না তুমি? এত রাত্রে? শান্তনুর বিস্ময়ের চাইতে ভয়টাই হয় বেশী।

এস, ভিতরে এস। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।

নায়না ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তেই, আলোয় তার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একি চেহারা নায়নার। চোখের কোলে কালি। গালে একটা কাল শিরার দাগ। সমস্ত শরীর একটা চাদরে আবৃত। অবশ্য তা ঠাণ্ডার জন্য। এই তো সেদিনও এমফিথিয়েটারে নায়নাকে সে দেখেছে। মাত্র তিনদিনের কথা। কত পার্থক্য সে মুখ আর এ মুখের। এবার শান্তনুর খুব ভয় হয়, ইভামাসির জন্য চিন্তা বাড়ে।

বল নায়না, কি হয়েছে তোমার ?

নায়না নির্বাক-নিষ্কম্প। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না।

শান্তনু অধৈর্য হয়ে ওঠে।

বল নায়না চুপ করে থেক না। তোমার কি হয়েছে ?

নায়নার জন্য শান্তনুর এত আগ্রহ এত ধৈর্যচ্যুতি নায়না আগে কখনও দেখে নি। নায়নার মনে হল তার সমস্ত দুঃখ সমস্ত বেদনা কে যেন ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। তার আর কিছু বলার নেই। কোন অভিযোগ নেই। সে তেমনই অপলক নয়নে চেয়ে থাকে শান্তনুর মুখের দিকে।

শান্তনুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। নায়নার শরীরটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে—

স্পীক নায়না, প্লীজ টেল মি হোয়াট ইজ দি রঙ উইথ ইউ? ইভামাসি? ইভামাসি কেমন আছেন?

চাদরের উপর দিয়ে হলেও নায়না বুঝতে পারে শান্তনু ঠিক তার আঘাতের স্থানেই হাত দিয়েছে। হাত ছাড়াবার কোন চেষ্টা না করেই বলে—

তিনি ভাল আছেন।

তাহলে কি হয়েছে তোমার, বল? শান্তনুর উদ্বেগের কোন তারতম্যই হয় নি। তেমনই অশান্ত কণ্ঠস্বর।

নায়না শান্তকণ্ঠে বলে—

তোমায় কনগ্রাচুলেসন জানাতে এলাম শান্তনু। সেদিন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

শান্তনু এবার ধমক দেয়।

ডোন্‌ট কাট জোকস্‌ নায়না। ঠাট্টা করার আর সময় পেলে না। এই বেশে কেউ কনগ্রাচুলেসন জানাতে আসে! তাও এত রাত্রে এই ঠাণ্ডায়।

শান্তনু রীতিমত ধমক দেয়।

বল নায়না। হোয়াট্ ইজ দি ম্যাটার?

নায়না আবার গম্ভীর হয়।

আই হ্যাব লস্ট মাই চেস্টিটি।

আঃ নায়না কি হচ্ছে, কি যাতা বলছ তুমি? সত্যি বল কি হয়েছে তোমার?

বললাম তো, হ্যাব লস্ট মাই চেস্টিটি।

নায়নার কথার দৃঢ়তায় এবং চেহারায় শান্তনুর চিন্তা বাড়ে।

হ্যাজ এনি ওয়ান আউটরেজড ইউ।

নায়না খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

ওঃ, এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই বুঝতে পার নি শান্তনু। তুমি সেই ছোটবেলার মতই বোকা রয়ে গেছ দেখ্ছি। এতক্ষণে বুঝলে, আই এ্যম আউটরেজড বাই সামবডি! আমার কথা শুনে বুঝলে? দেখে বোঝ নি? বাট বাই হুম?

মাই হাজবেণ্ড। তুমি চেন না, এলাহাবাদের ডেপুটি কমিশনার মাইকেল জওহর কোহলী।

হাজবেণ্ড কথাটা শুনে শান্তনু স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আপনা হতেই নায়নার শরীর থেকে তার হাত-দুটো আলগা হয়ে পড়ে।

শান্তনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—

আর ইউ ম্যারেড নায়না?

হ্যাঁ, তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! হ্যাঁ তোমায় জানান হয় নি। না ইভামাসিকে ভুল বুঝো না। আমিই জানাই নি। কোন দরকার ছিল না। আর তাছাড়া তোমার ঠিকানাও জানতাম না। সেজন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে নায়না হাঁপাতে থাকে।

তুমি বোস নায়না, ইউ লুক ভেরি টায়রড্।

নায়নাকে শান্তনু তার খাটের উপর বসিয়ে দেয়।

এবার বল, হাউ ইউ আর আউটরেজ্‌ড্? শান্তনুর গলায় সহানুভূতির সুর সুস্পষ্ট।

নায়না কিছুক্ষণ শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর আস্তে আস্তে চাদরটা খুলে, নিঃসঙ্কোচে অক্লেশে ব্লাউজটা তুলে পিঠটা শান্তনুর দিকে মেলে ধরে।

লুক হাউ? সী উইথ ইওর অন আইজ। অনুশোচনায়, অভিমানে নায়নার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে আসে।

ওঃ, হরিবিল! শান্তনু আঁতকে ওঠে। অশান্তভাবে বলে,

কিন্তু কেন? কেন নায়না, কেন তোমাকে এ রকম নির্দয়ভাবে মারলেন মিঃ কোহলী?

নায়না দৃঢ় গলায় বলে—

বিকজ, আই হ্যাব লস্ট মাই চেস্‌টিটি। আই হ্যাব টু পে ফর দ্যাট।

শান্তনুর কণ্ঠে এবার তীব্র প্রতিবাদের সুর। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে,—

নো, আই ডোন্‌ট বিলীভ দ্যাট। আমি বিশ্বাস করি না নায়না। দেয়ার মাস্ট বি সাম আদার কজ?

নায়না কোনদিন শান্তনুর এ কণ্ঠস্বর শোনে নি। কখনও এত শান্তনুকে উত্তেজিত হতে দেখে নি। শান্তনুর মধ্যে তার জন্য এত দরদ থাকতে পারে নায়না কোনদিন কল্পনাও করে নি। সে বিশ্বাস করল না—নায়না ক্যান লুজ হার চেসটিটি।

নায়না এবার শান্ত কণ্ঠে বলে,—

কেন, তুমিই তো একদিন বলেছিলে—এ ক্রিশ্চিয়ান গার্ল ক্যান ইজিলি লুজ হার চেসটিটি। মনে নেই সে কথা?

কিন্তু তোমার জন্য সে কথা বলিনি।

কেন ?

ইউ আর নট এ কৃশ্চিয়ান।

নায়না চমকে ওঠে শান্তনুর কথায়। চকিতে ঘুরে বসে শান্তনুর দিকে মুখ করে। তখনও তার ব্লাউজটা অনাবৃত। চাদরটা বিছানার উপর পড়ে।

সারটেনলি আই এ্যম ক্রিশ্চিয়ান। আই এ্যম ডটার অর মিঃ এণ্ড মিঃ টেলর। ইয়েস আই এ্যম এ কৃশ্চিয়ান বাই বার্থ, বাই কালচার, বাই ম্যারেজ। শান্তনু, আই ক্যান নট লুজ মাই চেসটিটি এগেন।

শান্তনু এত দুঃখের মধ্যেও নায়নার এই প্রতিবাদের ধরণ দেখে অবাক হয়। নায়না খুব আহত হয়েছে তার কথায়। মৃদু সহানুভূতির সুরে বলে—

নো নায়না ইউ হ্যাভ নট স্পয়েলড্ ইওর চেস্টিটি বাট ইউ হ্যাব লস্ট ইউর ভ্যানিটি। সেজন্য তোমায় আমি কনগ্রাচুলেট করছি।

নায়না শান্তনুর কথা বুঝতে পারে না। শান্তনু কিসে তার ভ্যানেটি দেখল। কবে তার ভ্যানিটি ছিল। শান্তনু তাকে বিদ্রূপ করছে নাতো ? এখনও কি শান্তনু তার জ্বালা বুঝবে না ?

একটু অবিশ্বাসের সুরে বলে,—

মনে রেখ শান্তনু, তুমি বলেছিলে—ইউ ডোন্‌ট কনগ্রাচুলেট উইদআউট এনি এচিভমেণ্ট।

শান্তনু সাথে সাথে বলে—ভ্যানেটি নষ্ট করাও একটা এচিভমেণ্ট। নিজের গ্লানির কথা স্বীকার করা কি সহজ কথা ?

নায়না ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় শান্তনুর উত্তরে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—

এর চেয়েও বড় গ্লানির কথা তোমায় বলতে এসেছি শান্তনু। নারী-জীবনে তার চাইতে বড় গ্লানি কিছু হতে পারে না। এতবড় গ্লানি বোধহয় তোমার সেই অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েদেরও নেই।

নায়না নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। রুদ্ধশ্বাসে বলে চলে—তুমি বলেছিলে অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে লোকে ব্যবসা করে, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। তারা অসহায়। তাদের গ্লানি কেউ বোঝে না। কিন্তু শান্তনু! তাদের গ্লানির কথা সমাজে অপ্রকাশিত নয়। তাই তাদের গ্লানি মুক্ত করতে অনেকে এগিয়েও আসে। তাদের জন্য তুমি আছ, ফাদার ইশপ্ আছেন।

নায়না এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকে। একটু থেমে আবার বলতে থাকে—

কিন্তু শান্তনু! সেই গ্লানি সমাজে অপ্রকাশিত, সেই গ্লানির কথা কেউ জানে না, সেই গ্লানি কারুর থাকলে প্রকাশ করতে সাহস করে না, সেই গ্লানি প্রকাশ করলে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, সেই গ্লানির কথা কে কাকে বলতে পারে? সেই গ্লানির যারা শিকার তারা বোধহয় সমাজের সব চাইতে বড় অন্যায়। তাদেব যে সব থেকেও কেউ নেই। কেউ নেই। না, কেউ নেই।

নায়নার কথায় শান্তনু হতবাক হয়ে যায়। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। তার দ্বিতীয় আর্টিকেলে আজ বোধহয় একটা নতুন অভিজ্ঞতার কথা যোগ করতে হবে। সমাজে অনাথ কারা?

কি শান্তনু চুপ করে রইলে কেন? তাদের জন্য কে করে? তুমি না বলতে, চেষ্টা করলে মানুষ সব পারে। তাদের জন্য কে চেষ্টা করে?

এবার শান্তনু একটু হেসে বলে—চেষ্টা তো কারুর জন্য কেউ করতে পারে না। চেষ্টা নিজের জন্যই নিজের করতে হয়। সমস্যা তো মানুষের নিজের সৃষ্টি। অপরে তার জন্য কি করতে পারে?

কিন্তু সমস্যা যেখানে অপরের সৃষ্টি। সমস্যা যেখানে, বেঁচে থেকে

মরে থাকা। সমস্যা যেখানে সব থেকেও অনাথ হয়ে থাকা, সমস্যা যেখানে অপরের কথায় চালিত হওয়া, সেখানে কোন্ চেষ্টার দ্বারা তা দূর করা যায়? নায়নার আজ শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন।

শান্তনু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে—এমন সমস্যা আছে বলে বিশ্বাস করি না।

নায়না গর্জে ওঠে—শোন শান্তনু, আজ তোমায় একটা নতুন কথা বলি। যারা মনে করে নিজের চেষ্টায় কিছু করেছে, তাদের চাইতে বড় স্বার্থপর কেউ নেই, তারা অপদার্থ। তারা অপদার্থ। তারা অপরের প্রয়োজন অনুভব করে না। করলেও স্বীকার করে না। স্বীকার করতে তাদের সম্মানে বাঁধে। দেখলে তো তোমারও অরফেন হাউসের জন্য একজন গভরনেসের দরকার পড়েছে। একটু সাহায্যের দরকার হয়েছে। নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পেরেছ কি?

শান্তনু চমকে ওঠে নায়নার কথায়।

তুমি গভরনেসের কথা কি করে জানলে?

নায়না সাথে সাথে বলে—খবরের কাগজে তোমার কাজে একটু সাহায্যের জন্য তোমার কাকুতি-মিনতি সমস্ত এলাহাবাদ সহর জানে।

শান্তনু অবাক হয়। নায়নাও তার আর্টিকেল পড়েছে? আশ্চর্য! কিন্তু সে তো শকুন্তলার মত সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেয় নি। তবে তার একথা বলার অধিকার কৈ। ইচ্ছে হয় দু-চার কথা শুনিয়ে দেয়। শান্তনু নিজেকে সংযত করে।

নায়না ক্ষিপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

বলতে পার শান্তনু যে স্বামী যেখানে নিরপরাধ স্ত্রীকে হুইপ করে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের শয্যাসঙ্গিনী হতে বলে; মুশৌরীতে ট্রেনিং প্রাপ্ত আই. এ. এস. অফিসারদের ডামী-ওয়াইফ হতে বলে, চেসটিটি বজায় রাখার জন্য ড্রিংক করতে বলে, স্ত্রী সেখানে কার সাহায্য চাইবে?

কি যাতা বলছ নায়না! কোহলী তোমায় এজন্য হুইপ করেছে? আমি একদম বিশ্বাস করতে পারছি না।

নায়না একটু ব্যঙ্গোক্তি করে বলে—

যে সমস্যার কোন সমাধান নেই, তা বিশ্বাস না করাই ভাল।

শান্তনু নায়নার কথায় দুঃখিত হয়। এক্ষেত্রে তার কি করণীয় বুঝতে পারে না। নায়নার কথা শুনে তারও একটু ভয় হয়। নায়নাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, বলে—

না, নায়না আমার বিশ্বাস তুমি মিঃ কোহলীকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করলে, তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। মনে আছে ইভামাসি বলতেন—মেয়েদের অনেক জ্বালাই সহ্য করতে হয়। স্বামীর জ্বালা সহ্য করতে পারাই তো মহান নারীর আদর্শ। স্বামী যে রকম দুঃখ দেন তেমন ভালবাসাও দেন।

নায়না শান্তনুকে কথা বলতে দেয় না—

নো, নো, হি ইজ এ স্কাউণ্ড্রেল!

ছিঃ নায়না এমন কথা বোল না, তোমার কাছে হাজবেণ্ড স্কাউণ্ড্রেল, অরফেন হোমের ছেলেগুলো ডারটি পুওর ফেলোজ, আমি অপদার্থ—তাহলে মানুষ কে?

কেন বলব না, তুমি মারবে, কোহলী হুইপ করবে, আমি কিছু বলতে পারবো না।

শান্তনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—আমি আবার মারলাম কবে?

কেন তুমি সেদিন আমায় রিকগনাইজ করলে না? কেন চিন্‌তে পারলে না?

শান্তনু আহত কণ্ঠে বলে,—

আমি বুঝতে পারি নি নায়না, হুজ ডিউটি ইট্ ওয়াজ। তুমি তো আমাকে অনেকক্ষণ দেখেছিলে। তখনও যখন চিনলে না। আমি বললেই কি চিনতে পারতে? আর চিন্‌তে পারলেই বা কি লাভ হত?

নায়না এবার চোখের জল রাখতে পারে না। রুদ্ধকণ্ঠে বলে—

তাহলে আজ তোমার কাছে এমন অভিযোগ নিয়ে ছুটে আসতে হত না। তোমার কাছে দাবী নিয়ে আসতে পারতাম। তোমার উপর জোর খাটাতে পারতাম।

শান্তনু শান্ত কণ্ঠে বলে—

সে পথ তো তুমি আগেই বন্ধ করে দিয়েছ নায়না।

নায়না তার আনত চোখদুটি শান্তনুর গম্ভীর মুখের উপর প্রসারিত করে বলে—কেন?

তোমার যে স্বামী অছে।

কিন্তু শান্তনু আমি যে কৃশ্চিয়ান, তুমি হিন্দু।

তাতে কি হয়েছে নায়না, আমরা তো মানুষ!

শান্তনু!—

নায়নার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। শান্তনুকে জড়িয়ে ধরে, তার বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

শান্তনু বাধা দেয় নি। কিছুক্ষণ পরে তার চিবুকটা ধরে মুখটা একটু তুলে বলেছিল—

ছিঃ নায়না ছেলেমানুষী কোর না।

পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়। কোমল মসৃন পিঠে সমুদ্রের ঢেউ খেলে গেছে। শান্তনুর মনে হল তার পিঠটাও ভীষণ জ্বালা করছে। শান্তনু ধীরে ধীরে নায়নাকে বোঝাবার চেষ্টা করে—

যাও নায়না। ফিরে যাও। মিঃ কোহলী নিশ্চয় তার ভুল বুঝতে পারবেন। ইভামাসি বলতেন—স্বামী কখনও স্ত্রীর অমঙ্গল করতে পারে না। নায়না একটু বিশ্বাসও করতে হয়। সব কিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে চলে না! তুমি যাও নায়না। আমি তো আছি। আর এমন হবে না। বিপদে পড়লে নিশ্চয় সাহায্য করব।

নায়না শান্তনুর কথায় ভরসা পেল কিনা, তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। আস্তে আস্তে বলে—

তোমার আদেশ আমি মেনে নিলাম শান্তনু।

শান্তনুও প্রত্যুত্তর দেয়—

আদেশ নয়, অনুরোধ।

এগার

আবার সেই সরস্বতীকুণ্ড। জায়গাটা অর্দ্ধেন্দুর ভাল লেগেছে। যতক্ষণ থাকা যায় মঙ্গল। আজকাল তুহিনাংশু বাবুও অর্দ্ধেন্দুর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এত জায়গায় তার জানাশোনা তবুও তিনি অনেক চেষ্টা করে ছেলের একটা চাকুরী যোগাড় করে দিতে পারলেন না।

যেখানেই একটু আশা হয়, পরে দেখা যায় তার চাইতেও ইনফ্লুয়েনসিবল লোকের তদবিরে অন্য কারুর সে চাকুরী হয়ে গিয়েছে। তুহিনাংশু বাবুর মনে হয় আজকাল যুগ অনেক পাল্টে গেছে। তাদের সময় চাকুরী করতে হলে এত তদবির তদারক করতে হত না। লোকে জানত ভাল করে লেখাপড়া শিখতে পারলে চাকুরী হবেই। সেইজন্যই তো বাপ মা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য বলতেন—লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। এটা তো রীতিমত একটা প্রবাদেই পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু রাজাগোপালন আর অর্দ্ধেন্দুকে দেখে তার সে ভুল ভেঙেছে। সম্প্রতি তিনি রিটায়ার করেছেন। এতদিন অত ভাবেন নি। রোজগার যথেষ্ট করতেন। অর্দ্ধেন্দু চাকুরী না করলেও টের পেতেন না।

দেশে কত এম. এস-সি. বেকার আছে জানবার জন্য তিনি সেদিন এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জে গিয়েছিলেন। সংখ্যা শুনে তার ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে গিয়েছিল। সাত হাজার।

কথাটা শুনে তিনি এমপ্লয়মেণ্ট অফিসারের দিকে ভীত স্বন্ত্রস্থ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন; তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটি কথা বেরিয়ে এসেছিল—

এম. এস-সি হয়েও!

তাকে আশ্বস্ত করার জন্য অফিসারটি বলেছিলেন,

বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা জানেন?

ইঞ্জিনিয়ার?

হ্যাঁ, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার?

কত?

আশী হাজার।

সেদিনই তুহিনাংশুবাবু বাড়ী ফিরে লাইব্রেরীতে ছোটবেলার সেই বইটা অনেক খুঁজেছিলেন। তাতে লেখা আছে, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'।

অনেক খুঁজেও পান নি। পেলে তিনি লাইনটা কেটে দিতেন। তার পরিবর্তে লিখে দিতেন, 'লেখাপড়া করে যে, না খেয়ে মরে সে'।

সম্প্রতি তুহিনাংশুবাবু অর্দ্ধেন্দুর জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বাড়িতে যেই আসে অর্দ্ধেন্দুকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন,

দেখবেন তো এর একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা?

অর্দ্ধেন্দুর খুব খারাপ লাগে। বাবার উপর রাগ হয়। একটু প্রেস্‌টিজ জ্ঞান পর্যন্ত নেই। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন নামকরা রিটায়ার্ড এড্‌ভোকেট, তিনি কেন সবার কাছে নিজের ছেলের জন্য চাকুরী ভিক্ষা করে বেড়াবেন। শুধু চাকুরী ভিক্ষাই নয়, মাঝে মাঝে তুহিনাংশুবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হত তাঁর

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে সুনীলবাবুকে বলছিলেন, অর্দ্ধেন্দুর চাকুরীর জন্য।

সুনীলবাবু খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তুহিনাংশুবাবুর সে প্রশ্ন শুনে। তিনি ভাবতেও পারেন নি যেই বাড়িতে তিনি নিজেই একদিন এই বেকারীর জ্বালা ঘোচাবার জন্য সামান্য একটা কাজ নিতে বাধ্য হন, সেখানে কেমন করে তিনি আরেকজনের চাকুরির সন্ধান দিতে পারেন। সুনীলবাবু এককালে এই বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন।

তুহিনাংশুবাবুকে রীতিমত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সুনীলবাবুকে নিরুত্তর দেখে, তুহিনাংশুবাবু বলেছিলেন, তা আর আপনিই বা কেমন করে চাকুরীর সন্ধান দেবেন। আমার মনে হয় আজকাল চাকুরীর সন্ধান দেবার চাইতে কোথায় কত লোক রিটায়ার করছে, ছাঁটাই হচ্ছে এগুলো বলা অনেক সোজা। দেশটা কি গোল্লায় যাবে মশাই ?

তুহিনাংশুবাবু কথা বলতে বলতে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। এজন্যই অর্দ্ধেন্দুর বাবার উপর রাগ হত বেশী। বাধা দিতে গেলেই এমন ধমক দেবেন, যা কোন এম. এস. সি পাশ করা ছেলের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, তার উপর বেকার হলে তো কথাই নেই। বেকারীর চাইতে কথার জ্বালা আরও অসহ্য মনে হয়।

এরপর শুরু হত বাবার জ্ঞান দেওয়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে হবে একটু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সেও এক ভীষণ ব্যাপার।

তুহিনাংশুবাবু একটা বরমা চুরুট ধরিয়ে বিজ্ঞের মত বলতেন— জানেন সুনীলবাবু এ সমস্ত হয়েছে, ব্যাড প্লানিং-এর জন্য। আমি জানতাম এ রকম হবে। আরে মশাই প্লানিং কমিশনে একজন আইন বিশেষজ্ঞ নেবার কথাটা সরকার একবারও গ্রাহ্য করল না। কতবার আমরা এলাহাবাদ বার এসোসিয়েশনের তরফ থেকে সরকারের কাছে এ প্রস্তাব জানিয়েছি। গ্রাহ্যই করলে না।

আর কিছু না হোক দেশের ছেলেমেয়েদের হাইয়ার এডুকেসন দিয়ে বেকার করে রাখার আইনগত অধিকার সরকারের আছে কিনা এ বিষয়েও তো তারা একটা পরামর্শ দিতে পারত।

চুরুটে একটা সুখটান দিয়ে বলতেন, মশাই আইন একটা যে সে কথা নয়। এই আইন দিয়েই দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। আইনকে অবহেলা করলে এই রকম দুর্দশাই হবে। আইন তো আর পরের জন্য নয়। আইন তো সবার জন্য। সরকারকেও একটা আইন মানতে হয়। এদেশে দেখছি সরকার মানুষের মুখাপেক্ষী কিন্তু মানুষের জন্য সরকারের করনীয় কিছু নেই। চাকুরী দেওয়ার দায়িত্ব তো নয়ই। এটা কখনও আইনসিদ্ধ হতে পারে না।

তুহিনাংশুবাবুকে থামান খুব কঠিন হত। এই রকম আইনের কচ্-কচানি চালাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পরিশ্রান্ত হয়ে থেমে যাবার পূর্বে রোজই এক কথা বলতেন অর্দ্ধেন্দুকে, কতবার বলেছিলাম, যা বিলেত থেকে গিয়ে ব্যারিস্টারিটা পাশ করে আয়। রিটায়ার করার আগে হাইকোর্টে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারতাম। তা মনে ধরল না কথাটা। ছেলে আমার সাইনটিস্ট হবে। দেশ উদ্ধার করবে।

নানাকারণে রাজাগোপালনের মত অর্দ্ধেন্দুরও আজকাল এই সরস্বতীকুণ্ডটা ভাল লাগে। রাজাগোপালন এ কথাটা অর্দ্ধেন্দুর চাইতে আগে টের পেয়েছে বলে অর্দ্ধেন্দুর বেশ হিংসে হচ্ছিল রাজাগোপালনের উপর। সরস্বতীকুণ্ড থেকে প্রাপ্য সুখটা কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করে নেবার জন্য অর্দ্ধেন্দু আজ রাজাগোপালনের চাইতেও দু-ঘণ্টা আগে এসে বসে আছে। সত্যি বেশ সুন্দর জায়গাটা। বেশ শান্ত। সাধে কি লোকে বলে, শান্তি পেতে হলে শান্ত পরিবেশের দরকার। খুব সত্যি কথা। কৈ তার তো বেকারীর জ্বালা এখন অত অনুভব হচ্ছে না। সহরে ঢুকলেই তো সেটা সব সময় মনে খচ্ খচ্ করে।

এই তো সেদিন শান্তনু ওকে আর রাজাগোপালনকে নিয়ে গিয়েছিল অরফেন হোমে। শকুন্তলা ওদের সমস্ত অরফেন হোমটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। কৈ সেখানেও তো এত শান্তি নেই। ভীষণ হৈ-হট্টগোল। শান্তনু তো তারই মধ্যে ডুবে আছে।

অর্দ্ধেন্দুর মনে হল এদিক দিয়ে সে শান্তনুর চাইতে সুখেই আছে। অখণ্ড সময়, আর সরস্বতীকুণ্ডের অফুরন্ত শান্তি। যমুনার স্নিগ্ধ স্পর্শ।

বেকার ভারতের আর একটা দিক। এদিকে তীর্থযাত্রীরা বিশেষ আসে না। তাই রোজগারী পাণ্ডারও খুব অভাব।

বেকারদের জন্য স্টাম্প মারা হয়ে গেছে। উঠতি প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছেও এটা অবাঞ্ছিত জায়গা। দুটি কারণে। যমুনার পারে পাবলিক পার্কটার মত এখানে কোন বসবার জন্য সুন্দর বেঞ্চ অথবা মেহেদী-গাছ কাটা আকর্ষণীয় কোন উদ্ভিদীয় মডেল নেই দ্বিতীয়তঃ স্থানটা একটু উচুনিচু এবং নির্জন হওয়ার দরুণ মাঝি-মল্লার ও পাণ্ডাদের, এমন কি বহু তীর্থযাত্রীরও প্রাতঃকৃত্য সমাপনের এক লোভনীয় স্থান।

বিশেষ গুণ না থাকলে এখানে এসে বসা দায়। অর্দ্ধেন্দুও প্রথম প্রথম পারত না। রাজাগোপালন বলত—সাধনার দরকার। অর্দ্ধেন্দু আজ রাজাগোপালনের কথা বুঝতে পারে। ভারতের আদর্শ জড়-ভরত ত্রৈলঙ্গ-স্বামীর কথা মনে পড়ে। তারা নাকি কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্দ্ধেন্দু বুঝতে পারে না। তাঁদের সাথে তার আর রাজাগোপালনের পার্থক্য কোথায়। বুঝতে পারে না যোগী আর বেকারের দূরত্বের মাপটা কত ?

তোমারও দেখছি আমার মত সুপারস্টিশন ডেভেলপ করেছে।

আমার কপাল না ফাটতেই। ব্যাপার কি ?

রাজাগোপালন হাসতে হাসতে অর্দ্ধেন্দুর পিঠের উপর হাত রাখে।

অর্দ্ধেন্দু আগের মত হাসতে পারে না। গম্ভীর মুখে বলে— তোমার আর আমার দূরত্বটা কমিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছি।

তাই নাকি? তা হঠাৎ এত নিকট হওয়ার বাসনা কেন?

অর্দ্ধেন্দু কিছুতেই সহজ হতে পারে না —না, রাজাগোপালন, ঠাট্টা করার কথা নয়। তোমার চাইতে নিকট আমার কেউ নেই।

তাহলে তো ভাই এই 'তুমির' আবরণটা তুলে ফেলতে হয়। নতুবা একাত্ম হওয়া যাবে না।

অর্দ্ধেন্দুর মুখে হাসি ফোটে।

ঠিক বলেছিস্। আমি অনেকদিন ভেবেছি। কিন্তু তোকে এ কথা বলতে সাহস করিনি।

রাজাগোপালন বাধা দেয়—থাক্ আর বোঝাতে হবে না। মনে হচ্ছে আমাদের তুজনেরই সেদিনের একমাত্র অবলম্বনটা কারুরই সম্বল হল না।

জানিস্, আমি জানতাম, চাকুরী আমাদের হবে না। ইনটারভ্যু ভাল হলেও না।

অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালনের কথায় সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছিস্, ইনটারভ্যুতে আমায় কি জিজ্ঞেস করল জানিস—আপানার কোন অরিজিনাল ওয়ার্কস আছে?

আমি বলেছিলাম—চাকুরীই পেলাম না, তো ওয়ার্কস।

শুনে বোর্ডের সবাই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। একজন বলেছিল, জানেন তো আমাদের এটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী। বলতে পারেন হোয়াই ক্যাটালিটিক্ এজেণ্টস্ আর নন-রি-এ্যকটিভ? আমি চুপ করে থাকাতে নিজেই বলেছিল—কি করে বলবেন; এর পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আজও আমরাই ধরতে পারলাম না।

এবার অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালনের হাতটা ধরে একটু আবেগের

সুরে বলে—জানিস্ বোর্ডে আমার পাঁচজন মেম্বার ছিল। প্রশ্ন করেছিল তিনজন। ওঠার সময় পাঁচজনই একসাথে বলেছিল—সরি, আমরা বোধহয় আপনাকে নিতে পারব না।

রাজাগোপালন একটু ঠেস দিয়ে বলেছিল—তোর তো এই, আর আমার কি জানিস্? তোর সাথে তো ভদ্র ব্যবহার করেছে। আর আমার বেলায় প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড়।

অর্দ্ধেন্দুর মুখেও কিছু বিস্ময়, কিছু ঔৎসুক্যের ছাপ; জিজ্ঞেস করে? কি রকম?

আর বলিস্ না। আমি জিও-ফিজিক্সের লোক। এক বেটা জিজ্ঞেস করেছিল—চাঁদে গিয়ে জাপানী প্রথায় ধানের চাষে কেমন ফলন হবে বলতে পারেন?

আমার খুব রাগ হয়েছিল প্রশ্নটা শুনে। বলেছিলাম, চাঁদের কথা বলতে পারি না, তবে আমাদের দেশে ফেইলিওর হয়েছে।

আরেক বেটা বলে উঠল—ননসেন্স, আপনাকে দেশের কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। চাঁদের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে।

আমিও বলেছিলাম—একটা উত্তর দিলে কি ভাল হবে স্যার। ওটা আমেরিকা আর রাশিয়ার এফেয়ার। অপর দেশের ইনটারনেল এফেয়ারসে হাত দেওয়া ভারতের সংবিধান-বিরোধী। আমি পঞ্চশীলা লঙ্ঘন করতে পারি না।

সাথে সাথে আরেকজন বলে ওঠে—থাক্, থাক্ আপনাকে আর সংবিধান শেখাতে হবে না—বলুন দেখি, হোয়াই এক্স্‌প্লোসিভস্ আর ডেন্‌জারাস্?

বুঝলি অর্দ্ধেন্দু, প্রশ্নটা শুনে আমি স্থির থাকতে পারি নি? হাতের আস্তিন্ গুটিয়ে ঘুষি বাগিয়ে বলেছিলাম—দেখবেন স্যার, এর ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দেব? কথা দিন তাহলে আমায় চাকুরী দেবেন।

ওরা পাঁচজনে একসাথে চেঁচিয়ে ওঠে—কি মারবেন নাকি?

সে এক বিতিকিচ্ছির কাণ্ড। আমি কিছু করবার আগেই তারা আপন আপন প্রেস্‌টিজ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের সে কাণ্ড দেখে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। হাসি চেপে বলেছিলাম—আসি স্যর, নমস্কার!

রাজাগোপালন অর্দ্ধেন্দুর বিস্ময়াবিষ্ট চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে—কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এর চাইতেও অবিশ্বাস্য কথা তোকে আজ বলতে এসেছি। আমাদের দু-জনেরই একটা চাকুরীর খবর।

অর্দ্ধেন্দুর মনে চমক্ লাগে—কি বলছিস্‌?

রাজাগোপালন একটু মুচকি হেসে পকেট থেকে একটা সিগারেটের কেস বার করল—একটা অর্দ্ধেন্দুর দিকে এগিয়ে দেয়। অর্দ্ধেন্দু সিগারেটটা নিয়ে অবাক হয়ে যায়।

একি, এযে কাপস্টেন সিগারেট! ভাল সিগারেট কেস। কোথায় পেলি এসব?

রাজাগোপালন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে—আর এই লাইটারটা বুঝি দেখছিস না? অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। আছে বন্ধু, কারণ আছে। সব কিছুরই কারণ আছে। এ গল্প একবারে বলার নয়। ক্রমে ক্রমে সমাপ্য, বুঝলি? আপাতত গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদটি তোকে বলি। রাজাগোপালন অর্দ্ধেন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলল।

অর্দ্ধেন্দু আঁতকে ওঠে সে কথা শুনে।

না, না, সে কখনও সম্ভব নয়। শান্তনু জানতে পারলে কি ভাববে বল দেখি?

রাজাগোপালন মুখটা বিকৃত করে বলে। ভারি কাউয়ার্ড তো তুই। তোর কাজটাতে ভয়, না, শান্তনুকে ভয়?

অর্দ্ধেন্দু শুক্‌নো কণ্ঠে বলে—উভয়কেই।

রাজাগোপালন দৃঢ় হয়—শান্তনুর ভার আমি নিলাম।

কাজটায় তোর সাহায্য দরকার। তোর করতেই হবে। খেয়াল আছে, তুই বেকার, দুবেলা বাপের গঞ্জনা সহ্য করছিস্। ইনটারভ্যুতে কুকুরের মত বিতাড়িত হচ্ছিস। এর পরও তোর আপত্তি?

অর্দ্ধেন্দু এতেও মনের জোর পায় না—ঠিক অছে। দেখি কি করতে পারি?

রাজাগোপালন অর্দ্ধেন্দুর পিঠ চাপড়ে বলে—এই তো মরদের মত কথা। চল্ দেখি শুভ কার্যের পূর্বে একটু সঙ্গমে স্নান করে আসি। ন'টা বাজে। আইডিয়েল টাইম ফর এ ডিপ, ইন দি গ্যানজেস্।

সঙ্গমের পারে এলাহাবাদ কোর্ট। কোর্টের নিচে অনেকখানি বিস্তৃত জায়গা। ঠিক যেন সমুদ্রের বেলাভূমি। নদীতীরে স্নান করলে কোন ফল হয় না। তাই নৌকো করে বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে সঙ্গম। থৈ থৈ করছে অথৈ জলরাশি। গঙ্গা যমুনার মিলিত হাতছানি ভীরুর মনেও প্রাণের স্পন্দন জাগায়। তাদের মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাসে কেমন এক অপরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হয় মনে। এটা ঠিক হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান করা নয়। নামার আগে কেমন ভয় হয় সেখানে। এখানে তার বালাই নেই। নৌকা থেকে লাফ দিয়ে জলে নামতে না পারলে যেন শান্তি নেই।

এখানে সঙ্গম তো শুধু গঙ্গা যমুনার নয়। এখানে সঙ্গম মানুষে প্রকৃতিতে। জড়ের সাথে প্রাণের, শোক তাপের সাথে পুণ্য সলিলার।

অর্দ্ধেন্দু নৌকা ভাড়া করে যেতে চায় নি। মাঝি, মল্লা আর পাণ্ডার ভয়ে। যেমন করেই হোক ঠিক পয়সা খসিয়ে নেবে। ঠিক সঙ্গমের জায়গায় জল বেশী না। বড় জোর কোমর অবধি হবে। পাণ্ডারা সেখানে জলের উপর বড় বড় তক্তা ভাসিয়ে দিয়েছে

তাদের ব্যবসার ভাগিদে। তক্তাগুলো নৌকার সাথে চেন দিয়ে বাঁধা। এরই উপর বসে পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীরা তর্পণ করে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে। যেমন খরচ তেমন ফল। ভাল খরচ করতে পারলে সাতপুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করা যেতে পারে। অর্দ্ধেন্দুর খুব খারাপ লাগত। ভারি বোকা মনে হত এই সব লোকদের। পয়সা খরচ করে কেউ সাত পুরুষ উদ্ধার করে নাকি?

তীর্থযাত্রী ছাড়াও এলাহাবাদের বাসিন্দা বহু লোকই আসে প্রত্যহ এই সঙ্গমে স্নান করতে। রোজ আসতে আসতে পাণ্ডাদের সাথে তাদের পরিচয় হয়ে গিয়েছে। তাদের অবাধ গতি এইখানে। যে কোন তক্তায় বসে পুজো করে, তর্পণ করে, নদীতে নেমে স্নান করে অনেকক্ষণ ধরে, কি আশ্চর্য পাণ্ডারা তাদের কিছু বলে না। সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিয়েছে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে। এমন কি স্নান সেরে নৌকোতে গিয়ে চন্দনের টিপটা পর্যন্ত। অর্দ্ধেন্দুর আশ্চর্য লাগত পাণ্ডারা এঁদের শুধু অব্যাহতিই দেয় নি, এদের কেমন একটু খাতিরও করে।

অর্দ্ধেন্দু অবশ্য তারও একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছিল। এঁদের বেশীর ভাগই মহিলা।

অর্দ্ধেন্দু আর রাজাগোপালনকে দেখেও পাণ্ডারা বেশী যন্ত্রণা করে নি। বুঝতে পেয়েছিল—তারা এলাহাবাদের লোক। কিন্তু পাণ্ডাদের স্কোপটা অর্দ্ধেন্দুই করে দিয়েছিল। তক্তার উপর থেকে জলে নাবতেই তার মনে কেমন এক শিহরণ হয়েছিল। অর্দ্ধেন্দু ভুলে গিয়েছিল সে কে, কোথায় আছে। একি আশ্চর্য অনুভূতি। চারিদিকে পুণ্যার্থী লোকের অহরহ মন্ত্র উচ্চারণ—গঙ্গে চ যমুনেচৈব, গোদাবরী সরস্বতী।

গঙ্গা যমুনার সাদা কালো জলরাশির আলিঙ্গন, নীল আকাশে সূর্যের স্নিগ্ধ-ভাতি সমস্ত পরিবেশটাকে কেমন মধুর করে দিয়েছে।

অর্দ্ধেন্দুরও কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে

স্পষ্ট উচ্চারিত হতে থাকে জয় গঙ্গা, জয় যমুনা, জয় সরস্বতী। একটু দূর থেকে রাজাগোপালনও তার ভাবোচ্ছ্বাস দেখে অবাক হয়ে যায়। এবার পাণ্ডারা নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করবে: মজা দেখার জন্য রাজাগোপালন সকৌতুকে অপেক্ষা করতে থাকে।

বাবুজী ইয়ে ফুল লিজীয়ে?

অর্দ্ধেন্দু চোখ বুঁজে বিড়, বিড়, করে কি যেন বলছিল। তক্তার উপর দাঁড়ান পাণ্ডার কথায় চোখ মেলে তাকালো। বেশ ভাল লাগল, সময় মত ফুলটা পাওয়ায়।

নিঃশব্দে হাত মেলে ফুলগুলো কৃতাঞ্জলিপুটে নিয়ে আবার অনেক্ষণ চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ভাসিয়ে দেয় গঙ্গায়।

বাবুজী ইয়ে দুধ ঢাল দিজীয়ে?

পাণ্ডাটি ছোট্ট একটা মাটির ভাঁড়ে করে এক ভাঁড় দুধ এগিয়ে দেয়। অর্দ্ধেন্দুও পরমনিষ্ঠা ভরে সেই দুধ ধীরে ধীরে ঢেলে দেয় সঙ্গমে।

বাবুজী ইয়ে ডাব লিজীয়ে? ভাসা দীজিয়ে গঙ্গামে। জাদা নেহী। ফুল এক রূপেয়া চার আনা।

শেষের কথাটা শুনে মুহূর্তে অর্দ্ধেন্দুর সমস্ত অনুভূতি কর্পূরের মত উবে গেল। কি বোকা সে। হি ইজ বিয়িং একস্‌প্লয়টেড্‌ না আমার চাই না? দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে অর্দ্ধেন্দু।

বাবু তাহলে সঙ্গমে স্নানের কোন ফলই হবে না। মৃদু হাসি পাণ্ডার মুখে।

অর্দ্ধেন্দু তাকে বাঙ্গালী ভেবে বাংলায় উত্তর দিল ফল আমি চাই না।

ছিঃ, বাবু এমন কথা বোল না, অমঙ্গল হবে।

অর্দ্ধেন্দুর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে, ভয় দেখান হচ্ছে। চেঁচাতে চেঁচাতে বলে—হোক দেখি অমঙ্গল, কেমন হয় দেখি। শুধু অমঙ্গল

কেন। আজই আমি মরব, তুমি মরবে, সব মরবে। আমার সাতপুরুষ মরবে। তোমার চোদ্দপুরুষ মরবে। দেখি কি হয়? সঙ্গম আমাদের মঙ্গল না করুক, কেমন করে অমঙ্গল করে দেখি। তাহলে বুঝবো সঙ্গম আছে, সঙ্গমের মহাত্ম আছে।

অর্দ্ধেন্দুর কথায় পাণ্ডার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। বহু যাত্রী সে দেখেছে, এমন যাত্রী দেখে নি কোনদিন না। অর্দ্ধেন্দু তার পাণ্ডা-জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অর্দ্ধেন্দুকে আর এগোতে না দিয়ে বলে—থাক বাবু, অনেক হয়েছে। ফুলের দু'আনা দুধের চার আনা দেবেন। তাতেই হবে। সঙ্গম আপনার মঙ্গল করুক।

রাজাগোপালনের খুব রাগ হয়েছিল পাণ্ডাটার উপর, সেও সাউথ ইণ্ডিয়ান বলে নয়। রাজাগোপালন স্পষ্ট দেখেছিল—গঙ্গায় ভেসে আসা অপরের উৎসর্গীকৃত একটা ডাব সে চকিতে তুলে নিয়ে অর্দ্ধেন্দুর হাতে দিয়েছিল।

নৌকোয় গিয়ে জামাকাপড় পরার সময় অর্দ্ধেন্দু রুক্ষ মেজাজে রাজাগোপালনকে বকছিল—তোরই জন্য এমন হল। বার বার বলেছিলাম গঙ্গার তীরেই স্নান করি।

রাজাগোপনও একটু ঠেস্ দিয়ে বলে—তোমার আবার হঠাৎ কোথা থেকে এত ভক্তি উথ্‌লে উঠবে, কে জানত বাবা।

অর্দ্ধেন্দু জামাকাপড় পরে নৌকোয় রাখা পাণ্ডাদের আয়না চিরুনী দিয়ে চুল না আঁচড়েই বলে—খুব হয়েছে, এবার তাড়াতাড়ি চল দেখি, আমাদের নৌকোয় গিয়ে উঠি। এখানে থাকলেই কেবল পয়সা আর পয়সা। অর্দ্ধেন্দু আর রাজাগোপালন নিজেদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্য পা বাড়ায়।

বাবু? নৌকোয় বসা পাণ্ডার ডাকে অর্দ্ধেন্দু ফিরে তাকায়।

বাবু, স্নান করলেন একটা চন্দনের তিলক পরবেন না?

না, দরকার নেই!—অর্দ্ধেন্দুর মুখে ক্রোধের ছাপ সুস্পষ্ট।

পাণ্ডাটি মৃদু হেসে বলে—বাবু তিলক পরতে হয়। পয়সা লাগবে না।

নৌকোয় ফিরবার পথে হঠাৎ অর্দ্ধেন্দুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দূরে একটা তক্তার কাছে। অর্দ্ধেন্দু চোখ ফেরাতে পারে না। এত দেহসৌষ্ঠবও থাকতে পারে কোন নারীর। মেয়েটা তাদের দিকে পিছন ফিরে ছিল। কোমরজলে দাঁড়িয়ে। হাত তুলে সূর্য প্রণাম করছে। পেছন থেকে হলেও স্পষ্ট বোঝা যায়—তার যৌবনের আকর্ষণ। ভেজা কাপড় আর সূর্যের উদ্দেশে উত্থিত বাহুমূলের মধ্য দিয়ে যৌবনের ছাপটা স্পষ্ট বেরিয়ে এসেছে।

জলের তলে লুকিয়ে থাকা বাকি অংশটুকু না বেরোন পর্যন্ত দেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তক্তাটার উপর একজন বয়স্কা বৃদ্ধা একমনে মালা জপ্‌ছিলেন। বোধহয় তার মাসি পিসি কেউ হবে।

অর্দ্ধেন্দু আস্তে করে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে রাজাগোপালনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজাগোপালনও সেদিকে তাকায়। অর্দ্ধেন্দুকে আর মেয়েটির মুখ দেখার সুযোগ রাজাগোপালন দেয় নি। তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠেছিল।

রাজাগোপালন খুব অবাক হয়েছিল শকুন্তলার এ মতিভ্রমে। ও আবার সঙ্গমে স্নান করা শিখল কবে?

বার

নায়নার খুব রাগ হচ্ছিল। ঠিক কার উপর নিজেও বুঝতে পারছিল না। বোধহয় নিজেরই উপর। কেন সে শান্তনুর কাছে গেল। কিসের আশায়? শান্তনুও তো তার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারল না।

সমস্ত পুরুষজাতটাই বোধহয় এ রকম। হয় পশু, নয়ত নির্বীর্য, কাপুরুষ। কেউ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। কেউ বা স্বার্থসিদ্ধ করার মত সাহস রাখে না বলে ভালমানুষীর মুখোশ পরে বেড়ায়।

নায়নার প্রতিকার নিজেকেই করতে হবে। ইভামাসির উপরও রাগ হচ্ছিল কম না। ঐ ইভামাসিই তো তাকে কতগুলি হিন্দু রীতিনীতি শিখিয়ে দিয়েছেন। কতকগুলো কুসংস্কার তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সকালে ওঠা, বাসি কাপড় ছাড়া, স্নান করা, শাড়ি পরা আরও কত কি। ইভামাসির জন্যই সে ড্রিঙ্ক করাটা পছন্দ করে না।

তার বাবা মিঃ টেলরও তো ড্রিঙ্ক করতেন। মাও মাঝে মাঝে বাবার সাথী হতেন। এটা যে ক্রিশ্চিয়ান কাল্‌চার। সে কি করে এর ব্যতিক্রম হয়। শান্তনু কি করে এটা বুঝবে? সবাই মানুষ হলেও সকলের ভিন্ন ভিন্ন আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি।

রাগে দুঃখে অভিমানে নায়নার মন ভরে যায়। কেন সে শান্তনুর কাছে নিজেকে ছোট করল। এটাও যে ক্রিশ্চিয়ান কাল্‌চারের বিরোধী। মিঃ কোহলী তো কোন অন্যায় করেন নি। তাকে তার কালচারটা নিতে বলেছে মাত্র। সে নেয় নি।

না এবার সে আর এমন করবে না। মিঃ কোহলীর কথাই শুনবে। আজ থেকে সে পুরোপুরি ক্রিশ্চিয়ান। ইয়েস নায়না মাস্‌ট লিভ এ ক্রিশ্চিয়ান লাইফ্‌। সী মাসট্ এন্‌জয়, মাস্‌ট শেয়ার হার প্লেজার উইথ মেনি।

কোহলীও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল নায়নার এ পরিবর্তনে। আজকাল শাড়ি পরা একদম ছেড়েই দিয়েছে। নিয়মিত ড্রিঙ্কও করছে। অবশ্য মাঝে মাঝে মাত্রাটা বাড়িয়ে ফেলে। মিঃ মেহটা তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

একদিন মিঃ কোহলীকে বলেই ফেললেন, ইউ আর রিয়েলী

এ ট্যালেন্ট। আপনার স্ত্রীকে এত পরিবর্তন করতে পেরেছেন। নায়না তো এখন অন্যান্য মিসেস্‌দের রীতিমত ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; কি স্মার্ট্‌, কি উইটি।

নায়না যে কোনদিন কনসার্‌ভেটিভ ছিল সে কথা মিঃ কোহলী স্বীকার করতে চায় নি। বলেছিল,

কেন, নায়না তো চিরকালই এরকম। ওর কতকগুলো স্ট্রেঞ্জ হবি আছে। মাঝে মাঝে পুরোদস্তুর বাঙালী সেজে থাকা। শাড়ি পরা, বাংলা গান গাওয়া এই সব। আমার মন্দ লাগে না।

এরপর মিঃ মেহেটাকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য জোর দিয়েই বলে, আসলে কিন্তু, সী ইজ আউট এণ্ড আউট এ ক্রিশ্চিয়ান।

নায়নার কথা কোহলী যত ভাবে, বিস্মিত হয়। ওদিন শান্তনুকে নিয়ে অত গোঁয়ার্তুমি না করলে, কেলেঙ্কারিটা হত না। সেদিনের ব্যবহারের জন্য মনে মনে একটু লজ্জাও হয়। তুচ্ছ কারণেই বাড়াবাড়ি করেছিল কোহলী সেদিন। কোহলী ঠিক করে সময় ও সুযোগ বুঝে একদিন নায়নার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কোহলী বুঝতে পারে না, কি করে নায়নার গালে সেদিন চাবুকের দাগটা পড়েছিল। অবশ্য মিঃ মেহেটা সেটা টের পাননি। সে নিয়ে কোহলীর সাথে বিশ্রী একটা ঠাট্টা করেছিলেন। আশ্চর্য নায়নাও কিছু বলে নি।

নায়নার জন্য মায়া হয় কোহলীর। শান্তনুর কথা আজকাল একেবারে বলে না, কোহলী এত অবুঝ নয়, সী ক্যান ইজিলি সেয়ার হার প্লেজার উইথ হিম।

একদিনও কোন পার্টিতে নায়না শান্তনুকে নিমন্ত্রণ করে নি। আশ্চর্য; নায়নার মতিগতি বোঝাই মুশকিল।

মিঃ আর মিসেস টেলরের কাছে কোহলী শান্তনুর কথা সব

শুনেছে। ছোটবেলা থেকে নায়নার সাথে তার সম্পর্ক। একদিন একটু খোঁজও করল না। শান্তনুর উপরও রাগ হচ্ছিল কোহলীর। ডি. এস. সি হয়েও সেন্টিমেন্টটা একটুও কমাতে পারল না। ওকি জানে সে রাত্রের ঘটনা?

শান্তনুকে বাদ দিয়ে নায়না এত আমোদ-স্ফূর্তিও করতে পারে। আজকাল ক্লাবে তার নাচের সাথী পাওয়া দায়। ড্রিঙ্ক করায় কারুর মিসেস্ কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

নায়না ইজ ভেরি মডার্ণ, অরথোডক্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ড ট্ কমপ্লেক্স।

দিন গেলেই মাস যায়, মাস গেলে কাল। এমনি করেই কেটে গেল একটা পুরো বছর। নায়না প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা, ভোলে নি কোহলীর দুর্ব্যবহার, শান্তনুর নিষ্ক্রিয়তা, মেহটার পশুত্ব। এর প্রতিশোধ সে নেবেই। পারলে সমস্ত পুরুষজাতির বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কোন পুরুষের উপর তার বিশ্বাস নেই। নায়নার দৃঢ় ধারণা পুরুষেরা হয় নিষ্ক্রিয় নতুবা লম্পট। নারীর সাথে তাদের দুই প্রকারের সম্পর্ক —উদাসীনতা, নতুবা চরম আসক্তি। বন্ধুভাবে পুরুষ কখনও নারীকে দেখতে পারে না। যে বন্ধু না হতে পারে, সে ক্ষমারও অযোগ্য। অন্তত নায়নার তাই বিশ্বাস। নায়নার হয়ত এ বিশ্বাস কোনদিনই ভাঙত না, যদি না সে নারীর আরেকটা রূপ টের পেত। নারী শুধু নারীই নয়, তারা মা।

নায়না একদিন টের পেল মেহটার সঙ্গে মেলামেশা বাড়াবাড়ির জেরটা। সে মা হতে চলেছে।

এত বড় অসহায় নায়না কোনদিন বোধ করে নি। সেই প্রথম ড্রিঙ্ক করার দিনও না।

রাগে, দুঃখে, অপমানে নিজের উপর অত্যাচার করা যায়, অভিমান করা যায়, প্রয়োজনে বিষ খেয়ে মরা যায়। কিন্তু

তাবলে আরেকটি প্রাণীর উপর সেই অন্যায়, অবিচার চাপিয়ে দেওয়া যায় না। নায়না কি করবে বুঝতে পারে না।

ইভামাসির কথা আবার মনে পড়ে। বলতেন, মেয়েদের মা হবার চাইতে বড় আনন্দ জগতে কিছু নেই। মা হতে পারলে মেয়েরা স্বামীকেও চায় না। সব চাইতে বড় শক্তি যে মাতৃত্বে। মা না হওয়া অবধি মেয়েরা যে অসহায়। মনে পড়ে তার ভারজিন মাদার এণ্ড দি বেবীর কথা। মনে পড়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান ধর্মের কথা। না কোথাও মাতৃত্বের মহিমাকে ছোট করা হয় নি। অবৈধ মাতৃত্বের বেলায়ও না।

না, নায়না কিছুতেই ঐ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেনা। কোহলী বলত—দেখ নয়না, আই শ্যাল মেক ইউ মাদার আফটার ফরটি। আপ টু ফরটি উই মাস্ট এন্‌জয়। কি বল?

যতই দিন যায় নায়নার দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। না আর দেরী করা ভাল হবে না।

বহুদিন বাদে আবার একদিন নায়না খুব ভোরে উঠল, বাসি কাপড় ছাড়ল। স্নান সেরে শাড়ি পরল। ব্রেক ফাস্টের সময় কোহলী তাকে দেখে বলল—

যাক আমার একটা মস্ত ভাবনা গেল নায়না। তোমাকে বহুদিন জিজ্ঞেস করব ভেবে আর বলা হয়ে ওঠে নি। তুমি শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছিল কেন?

আজ যে তোমায় একটা সুখবর দেব। নায়না হাসবার চেষ্টা করে।

সত্যি! কোহলী একটা স্যান্‌ডুইচে কামড় দিয়ে বলে, দেখো আমার বিরুদ্ধে ডাইভোর্স করার প্রস্তাব নয় তো!

এবার নায়নাকে কাছে টেনে বলে—বলনা কি ব্যাপার?

নায়না আস্তে আস্তে বলে—আমি মা হতে চলেছি।

হোয়াট!—

কোহলী আচমকা নায়নাকে ঠেলে দেয়। নায়না বহুদিন পরে আবার কোহলীর চোখের সেই হিংস্র চাহনি দেখতে পেল। পার্থক্য সেদিন ছিল রাত্রে আজ সকালে, সেদিন কোহলী ছিল মাতাল, আজ প্রকৃতিস্থ।

হঠাৎ কোহলীর সমস্ত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ পালটে যায়। নায়না অবাক হয়। এত দ্রুত কারুর মুখমণ্ডলের পরিবর্তন সম্ভব?

কোহলী একটু বিদ্রূপ করে বলে,--দেখ নায়না, তুমি মডান গার্ল হয়েও মডার্ন লাইফ লীড করতে জান না দেখে খুব আশ্চর্য হচ্ছি। ইউ ডু নট নো, হাউ টু এ্যাভয়েড ক্যারিয়িং। তোমার জানা উচিত ছিল, এ মডার্ন গার্ল মাস্ট নট ক্যারি বিফোর ফরটি।

নায়না অপরাধীর মত মুখ নীচু করে থাকে।

এবার নায়নাকে সান্ত্বনা দেয় মিঃ কোহলী—অব কোর্স ইট ইজ নাথিঙ্গ ডেন্‌জারাস্। তোমার দুই একদিন একটু কষ্ট হবে আর কি! নায়নার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—ভয় পেও না। এলাহাবাদের শ্রেষ্ঠ নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করে দেব। দেখ কিছু টেরই পাবে না।

না, না, এ কখনও সম্ভব নয়। কোহলী, আমাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত কোর না? প্লীজ তোমায় আমি অনুরোধ করছি।

হোয়াট ডু ইউ মিন, তোমার এ সন্তান আমি স্বীকার করে নেব? নেভার, ইট ইজ এ প্রডাকট্ অব এডাল্‌ট্রি এণ্ড উইকনেস্। জারজ সন্তানের কোন স্থান নেই সমাজে জান?

না, কোহলী, প্লীজ ডোন্‌ট ডেপ্রাইভ মি অব মাদারহুড? ওকে কোন অরফেন হোমে দিয়ে দিও। সেও ভাল।

নায়নার কণ্ঠে কাকুতি মিনতি।

কোহলী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—আবার সেই সেন্‌টিমেন্‌টাল্ কথা।

জান, কাউকে সারা জীবন পলে পলে দগ্ধ করার চাইতে হত্যা করা অনেক ভাল।

নায়না শিউরে ওঠে কোহলীর কথায়।

না, আমি কিছুতেই তা করতে পারবো না। কখন না। নায়না তীব্র প্রতিবাদ করে।

কোহলী ঘৃণার সঙ্গে বলে,—

এর চাইতে বেশী তোমার থেকে আশা করি নি নায়না। আমারই ভুল হয়েছিল। ইউ ক্যান নেভার বি এ ক্রিশ্চিয়ান, এণ্ড এ রিজনেবল লেডী। তুমিও তো তাই, এ প্রডাক্ট অব এডাল্টরি এণ্ড উইকনেস্। তুমিও তো জারজ।

নায়না চম্‌কে ওঠে কোহলীর কথায়।

কি, কি বল্‌লে তুমি? এতবড় অপবাদ তুমি দিতে পারলে কোহলী। মিঃ এণ্ড মিসেস্ টেলর তোমারও নিকট আত্মীয় জান?

জানি। কোহলীর ছোট্ট উত্তর অথচ দৃঢ়।

বাট্ দে আর নট ইওর পেরেন্টস্।

কোহলী! নায়না উত্তেজনার কথা বলতে পারে না। কোহলী ধীরে ধীরে বলে।

এ কথা জানা থাকলে আমি কখনই তোমায় বিয়ে করতাম না নায়না। বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে, আমি যথেষ্ট এ্যডজাস্ট করে চলার চেষ্টা করেছি। এখন দেখছি ভুল করেছি। তুমি বোঝবার পাত্রী নও। জান বোধহয় ক্রিশ্চিয়ান মতে এ বিয়ে সিদ্ধ নয়—এ প্রতারণা। নিজের পরিচয় যদি কখনও আনতে পার চেষ্টা করে দেখব তোমায় গ্রহণ করতে পারি কিনা।

নায়নার তর্ক করার কোন ক্ষমতা ছিল না। অধিকারও নয়। নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে এসেছিল, ডেপুটি কমিশনার মিঃ কোহলীর বাংলোর বাইরে। কোথায় যাবে সে। কার কাছে? শাস্তনু? না, কখনও না।

নায়নার হঠাৎ খেয়াল হল, সে পেরেন্টলেস হতে পারে, কিন্তু অনাথ নয়।

ইভামাসি এখনও জীবিত আছেন।

তের

অর্দ্ধেন্দুর বেশ ভাবনা হয়েছিল রাজাগোপালনের প্রস্তাব শুনে। শান্তনুর এত বড় অপকার তারা করবে কি করে? না, না অর্দ্ধেন্দু একাজ করতে পারবেনা। আবার রাজাগোপালনের কথার খেলাপ করতেও অর্দ্ধেন্দুর ভয় হয়।

বার বার বলে গিয়েছে সন্ধ্যা সাতটার সময় অরফেন হোমের গেটের সামনে অপেক্ষা করতে। রাজাগোপালনের মতলবটা যে কি, অর্দ্ধেন্দু ঠিক বুঝতে পারেনি। সারাটা দিনই কাটলো মহা দুর্ভাবনায়।

তুহিনাংশুবাবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন,—তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে অর্দ্ধেন্দু?

অর্দ্ধেন্দু কোন উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার মত মনের অবস্থাও ছিলনা।

সন্ধ্যা সাতটায় অরফন্ হোমের সামনে যাবে কি যাবেনা এটাই ছিল তার কাছে আপাততঃ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

বিকেল হতে অর্দ্ধেন্দুর অন্তর্দ্বন্দ্বটা বেড়েছিল বই কমেনি। সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার অবসান ঘটিয়ে অর্দ্ধেন্দুর পা দুটো কখন যে অরফন হোমের সামনে এসে পড়িয়েছিল অর্দ্ধেন্দু নিজেই তা জানেনা।

রাজাগোপালন আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। অর্দ্ধেন্দুর পিঠ চাপ্ড়ে বলে—ইউ আর রিয়েলি ব্রেভ অর্দ্ধেন্দু। এই না হলে মরদ। আমি তো ভেবেছিলাম ভয়ে তুমি আসতেই পারবেনা।

তারপর তাকে আশ্বস্ত করে বলে, ভয় নেই বন্ধু, শান্তনু কিছুই জানতে পারবেনা। শকুন্তলাকে আগেই বলে রেখেছি।

শকুন্তলা নামটা শুনে অর্দ্ধেন্দুর বিস্ময়ের ঘোরটা আরও বেড়ে যায়। এমন একটা কাজে শকুন্তলা তাদের সাহায্য করতে পারে, এ কথাটা অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস করতে পারছিলনা।

যাকে শান্তনু এত বিশ্বাস করে অরফেন হোমের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়েছে, সে কেমন করে এমন একটা জঘন্য অপরাধ করতে পারে? অর্দ্ধেন্দু প্রথমে ভেবেছিল, শকুন্তলা ও শান্তনু দুজনকে ফাঁকি দিয়েই তাদের বোধহয় কাজটা সারতে হবে, এ যে সে কথা নয়। একেবারে শান্তনুর ঘরের মধ্যে থেকে আয়রন সেফ ভেঙে টাকা নিয়ে আসা।

অর্দ্ধেন্দুকে এ রকম চুপ করে থাকতে দেখে রাজাগোপালন বলে—ঐ দেখ, আবার তোর ভাবনা, আরে বাবা টেক্ ইট ইজি। তুই তো আর অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছিসনা। অরফেন হোমের ছেলেমেয়েদের জন্য তুলেরাখা টাকার অংশের একটা ভাগ বসাতে যাচ্ছিস। এতে দোষটা কি বলতো?

অর্দ্ধেন্দু রাজাগোপালনের কথায় ঠিক ভরসা পায়না। রাজাগোপালন বলে চলে,—ত্যাখ,শান্তনুর থেকে টাকা চাইলে আমি পেতে পারি জানি, কিন্তু তুই বল, যার সঙ্গে একসাথে এম. এস.-সি. পাশ করলাম তার কাছে হাত পাতি কি করে? তার চাইতেও বড় কথা কি জানিস্ আমাদের বুজুম ফ্রেণ্ড হয়েও আমাদের দুঃখটাও বুঝল না।

রাজাগোপালন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও বাম হাতের তালুর উপর একটা ঘুষি মেরে বলে, নো অর্দ্ধেন্দু, নো ফিয়ার, ভয় পেলে কোন কাজ হয়না, প্লিজ বি স্ট্রং। চলো আর ভাবনা নেই।

অর্দ্ধেন্দুকে আর কোন অবকাশ না দিয়ে রাজাগোপালন অরফেন হোমের মস্ত গেট দিয়ে অর্দ্ধেন্দুকে এক প্রকার টানতে টানতেই ভেতরে নিয়ে যায়।

ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে উপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির পরেই মস্ত লম্বা একটা বারান্দা। অনেক দূর গিয়ে শেষ প্রান্তে বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। সেখান থেকেই ফিমেল ব্লকের শুরু। তারই মাঝামাঝি একটা ঘরের সামনে রাজাগোপালন অর্দ্ধেন্দুকে নিয়ে থামলো।

মে আই কাম ইন?

কে? রাজাগোপালন? মেয়েলী কণ্ঠস্বরে অর্দ্ধেন্দুর বুঝতে বাকী থাকে না এ শকুন্তলারই গলা।

ভিতরে ঢুকতেই অর্দ্ধেন্দু দেখলো, সাধারণ শাড়ী পরা, কপালে টিপ, কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুলে পরা বিনুনী এক সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতন অসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে সেই মেয়েটি। এ যেন শকুন্তলা নয়—আর কেউ।

আরে, অর্দ্ধেন্দুবাবু এসেছেন দেখছি! শকুন্তলার প্রশ্নে অর্দ্ধেন্দু চিন্তা ছিন্ন হল।

আমি তো জানতাম রাজাগোপালনই গোল্লায় গেছে, সেই সাথে আপনিও? ও কেন এসেছে জানেন?

জানি। অর্দ্ধেন্দুর ছোট্ট অথচ দৃঢ় উত্তরে রাজাগোপালনও বিস্মিত হয়।

আপনি পারবেন, এ কাজ করতে?

আপনার সাহায্যে শান্তনু যখন এতবড় একটা অরফেন হোমের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে, সেখানে আপনার এবং রাজাগোপালনের সাহায্য পেলে আমি কেন এই সামান্য কাজটা করতে পারবোনা?

এবার অর্দ্ধেন্দুর উত্তরে শকুন্তলাও অবাক হয়।

চলুন, আপনার বুকের পাটাটা কত বড়, তাই দেখি। এই নিন চাবি। ঐ যে পর্দা টাঙানো পাশের ঘরটা, ওটাই শান্তনুর ঘর। ঢুকেই দেখবেন ঠিক তার সামনের খাটের উল্টোদিকের

দেওয়ালে আয়রণ সেফ্‌টা। এই চাবি দিয়ে খুলে চট্‌পট্‌ দুহাজার টাকা নিয়ে আসুনতো। শকুন্তলার কণ্ঠে হেঁয়ালী না বিদ্রূপ অর্দ্ধেন্দু বুঝতে পারে না।

অর্দ্ধেন্দুকে নীরব দেখে শকুন্তলা বলে,—ভয় পেলেন নাকি? ভয়ের কিছু নেই। আঙুলের ছাপ পড়বেনা, আর তাছাড়া শান্তনু টেরও পাবেনা। ও আজকাল এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কম।

অরফেন হোমের ছেলেমেয়েদের প্রতি দরদটাও ঠিক আগের মত নেই। প্রায়ই কারণে অকারণে কর্তব্যে একটু অবহেলা হচ্ছে। একটু শাস্তি হওয়া দরকার।

অর্দ্ধেন্দু এবার প্রতিবাদের সুরে বলে—আপনার থেকেও আমি বেশীদিন শান্তনুকে দেখেছি, মিস্‌ শকুন্তলা। ওর টাকা আমরা নিতে পারি কিন্তু কর্তব্যের অবহেলার দোষে অপবাদ দিতে পারিনা।

শকুন্তলা একটু ভ্রূ-কুঁচকে বলে,—তাই নাকি? সৌর কলঙ্কেও দেখি আপনার অবিশ্বাস। চাঁদের কলঙ্কটা আমরা সহজেই বিশ্বাস করি কারণ সেটা খালিচোখেই দেখা যায়, সূর্যের কলঙ্কটা দেখতে হলে রঙিন চশমা লাগে। যাদের সেটা আছে তারাই দেখতে পায়।

আপনি দেখেছেন নাকি?

না দেখে বলা শকুন্তলার স্বভাব বিরুদ্ধ।

এবারে অর্দ্ধেন্দু উত্তেজিত হয়ে বলে—

কি, কি দেখেছেন আপনি এমন শান্তনুর, যাতে এ ধরনের অপবাদ দিতে পারছেন।

শকুন্তলা একটু মুচকি হেসে বলে,—সেদিন ডি. এস.-সি নেবার সময় শান্তনুর হঠাৎ মানসিক পরিবর্তনের কারণটা জানেন কি?

অর্দ্ধেন্দু এবার হেসে ফেলে।

হ্যাঁ জানি, তবে সে কথাটা আপনাকে বলা যায় কিনা ভাবছি।

অভয় দিলাম, বলুন।

বলবো ?

বললাম তো বলুন।

আপনি।

এবার শকুন্তলা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে—কিছুই জানেন না, অর্দ্ধেন্দুবাবু। কারণটা আমি নই, নায়না এলিজাবেথ।

নায়না ? অর্দ্ধেন্দু বিস্মিত হয়।

শান্তনুর মুখে তো কোনদিন এনাম শুনিনি। ভাল করে জানার জন্য অর্দ্ধেন্দু জিজ্ঞাসা করে—

নায়না, কে নায়না ?

মৃদু হেসে চোখ দুটো রহস্যাবৃত করে মিস্ শকুন্তলা রসিয়ে বলে—সূর্যের কলঙ্ক।

রাজাগোপালনের আর সহ্য হলো না। শকুন্তলার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে,—

রাখো তোমাদের রসের আলাপ। শান্তনু এসে হাজির হলে সব মাটি হবে।

বলেই দ্রুতপদে রাজাগোপালন গিয়ে ঢোকে শান্তনুর ঘরে। পর্দার আড়ালে রাজাগোপালন অদৃশ্য হয়ে যেতেই অর্দ্ধেন্দুকে উদ্দেশ্য করে শকুন্তলা বলে,—

পাগল, একেবারে পাগল মশাই।

অর্দ্ধেন্দুর কোন ভাবান্তর হলো না।

বন্ধুর কথায় মন খারাপ হল বুঝি ? তা বলে সত্য তো আর অপ্রকাশিত থাকে না। আজ না হোক কাল একথা তো জানতেই পারতেন। অপ্রিয় কথাটা বলার জন্য দুঃখিত। অবশ্য সেটা পুষিয়েও দিচ্ছি। এই দুহাজারের মধ্যে একহাজার আপনার একহাজার রাজাগোপালনের।

অর্দ্ধেন্দুর মুখে ঘৃণার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আপনার লজ্জা করলোনা, এ কথা বলতে ? শান্তনুর টাকাতে হাত দেবার আপনার কি অধিকার ?

শান্তনুর টাকা? কে বলেছে শান্তনুর টাকা? সব ডোনেশন বুঝলেন, সব ডোনেশন। মানুষের টাকা মানুষে না নিলে কে নেবে, বলতে পারেন?

এই নাও তোমার চাবি। রাজাগোপালনের হাতে দুই বাণ্ডিল নোটের তাড়া। একটা অর্দ্ধেন্দুর দিকে এগিয়ে বলে—

নে, এটা তোর প্রাপ্য। আজই বাবার জন্য একজোড়া ধুতি, একটা পাঞ্জাবী, আর একজোড়া পাম্পস্যু কিনে নিয়ে যা। হ্যাঁ, ভাল কথা, মর্নিং ওয়াকের স্টিকটা নিতে ভুলিসনা। তারপর একটু থেমে রাজাগোপালন কি ভাবলো। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে রাজাগোপালন—

না, না, ওসব কিছুনা সব বাজে। চল্ লেট আস্ গো টু ক্লার্কস হোটেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লার্কস হোটেল। লেট আস্, এঞ্জয়, এঞ্জয় অর্দ্ধেন্দু। কতদিন টাকার মুখ দেখিনি।

তারপর শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বলে—

থ্যাঙ্ক ইউ শকুন্তলা। তুমি মিস্ রমানার চাইতেও বড়। মিস রমানা গিব্স প্লেজার টু আদার্স বাট ইউ গিভ মানি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানি ইজ সুইটার দ্যান হানি, গ্রেটার দ্যান প্লেজার।

অর্দ্ধেন্দুকে কোন কথা, কোন প্রতিবাদ, কোন উক্তি করার সুযোগ না দিয়ে যেমন হড়হড় করে টান্‌তে টান্‌তে ভিতরে নিয়ে এসেছিল তেমনই দ্রুতপায়ে শকুন্তলার ঘরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল রাজাগোপালন।

রাত তখন আটটা, এলাহাবাদের ক্যান্টনমেন্টের ইশপ অরফেন হোমের বাইরে দুই যুবকের আনন্দোচ্ছাস দেখলে যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন তারা বেকার না ভ্রমণ বিলাসী। তারা চোর না ধনীর ঘরের দুই দুলাল।

অর্দ্ধেন্দুর অনেক বাধা নিষেধ সত্ত্বেও রাজাগোপালন ড্রিঙ্ক করেছিল, জোর করে ড্রিঙ্ক করিয়েওছিল। অর্দ্ধেন্দুকে আশ্বস্ত করে বলেছিল—

ড্রিঙ্কই ইজ এ ক্রাইম হোয়েন ইউ ডোনট্ হ্যাভ মানি। ড্রিঙ্ক ইজ ভিগার, এনার্জি ইফ্ ইউ হ্যাভ মানি। দেখো পকেটে একগাদা টাকা থাকলে, চোখে মদের নেশা, মুখে গন্ধ, জড়ানো কথা নিয়ে বাড়ী ফিরলেও বাবা কিছু বলবেন না।

কথাগুলো বলে রাজাগোপালন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় অর্দ্ধেন্দুর দিকে, ফিস্‌ফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—

প্রথম অঙ্ক তো শেষ হোল, দ্বিতীয় অঙ্কটা বলি।

রাজাগোপালনের সে প্রস্তাব শুনে অর্দ্ধেন্দু তীব্র প্রতিবাদ করে উঠেছিল—

না। এ আমি কিছুতেই করতে পারবোনা।

রাজাগোপালনকে তখন নেশায় ধরেছে।

সাট আপ্! জানিস তোর আর ফিরবার কোন পথ নেই। তুই চোর। তুই মাতাল। তোকে এ কাজ করতেই হবে।

অর্দ্ধেন্দুর নেশার ঘোর কেটে যায়। বলে—

কি আমি চোর? আমি মাতাল? না ইম্‌পসিবল কখনোই না।

রাজাগোপালন ক্লার্ক হোটেলের এয়ার কণ্ডিশনড্ ঘরের একটা টেবিলে প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বলে—

আলবাৎ তুই চোর। শুধু চোরই নস চোরের সাথী মাতালের বন্ধু। ভবিষ্যতে অতসী, বনলতা, এমিলি ও লিসার দালাল।

অতসী, বনলতা, এমিলি, লিসার দালাল। অস্ফুটস্বরে রাজাগোপালনের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে অর্দ্ধেন্দু।

রাজাগোপালন আরেক পেগ মদ গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলে—শুধু দালালই নস্, ওদের যেটাকে ইচ্ছে বাগাতে পারিস। মনে আছে একদিন শকুন্তলাকে দেখে বলেছিলি—এ রকম কত মাল আছে সাউথ ইণ্ডিয়ায়। গ্যাখ্ সেই শকুন্তলাই যোগাড় করে দিয়েছে এদের। তোদের নর্থ ইণ্ডিয়া থেকেই। দে আর ইগারলি ওয়েটিং ফর আস্।

অর্দ্ধেন্দুর নেশার ঘোর অনেকক্ষণই কেটে গিয়েছিল,

তুই কি বলছিস্ রাজাগোপালন? মিস্ শকুন্তলা এমন করে শান্তনুর সর্বনাশ করতে পারবে?

একটু থেমে অর্দ্ধেন্দু আবার বলে,

যাই বলিস্, এ আমি কিছুতেই করতে পারব না। শান্তনু দু-বেলা কত স্বপ্ন দেখে, ওদের মানুষ করবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার এ স্বপ্ন আমি নষ্ট হতে দেব না রাজাগোপালন, কিছুতেই না। আমি শান্তনুকে সব বলে দেব।

খবরদার, বিশ্বাসঘাতকতার কোন ক্ষমা নেই জানিস্? আর তুই কাকে কি বলবি? শকুন্তলার কথা শুনেও বুঝলি না শান্তনু কেমন লোক। জেনেশুনে একজন বিবাহিত মহিলার সর্বনাশ করছে।

অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস করতে পারে না।

কি বলছিস তুই রাজাগোপালন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শকুন্তলা নিজের চোখে দেখেছে—গভীর রাত্রে নায়নাকে তার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যেতে। এর পরও কি শান্তনুর মোহ ভঙ্গ হবে না তোর। ভুলে যাচ্ছিস কেন অর্দ্ধেন্দু—অবিশ্বাস, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এগুলোই তো মডার্ণ স্লোগান। যে অক্লেশে করতে পারে সেই জয়ী হয়। দেয়ার ইজ নো প্লেস অব হেজিটেসন ইন্ ইট।

অর্দ্ধেন্দুর মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে—রাজাগোপালন, সোসাল্ সায়েন্সে এম. এ.টা পাশ করতে পারলে অন্ততঃ এদিকটা বুঝতে বোধহয় এত কষ্ট করতে হত না।

চোদ্দ

মিস্ রমানাকে সেদিন শকুন্তলার ঘর থেকে বেরোতে দেখে শান্তনুর কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। অতসীকে শান্তনু অনেক কষ্টে য়্যুনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়েছে। অতসীর উপর শান্তনুর অনেক ভরসা। অরফেন হোমের মেয়েদের মধ্যে ওই সব চাইতে বেশী বুদ্ধিমতী। কে বলবে একদিন তাকে এলাহাবাদের এক ডাস্ট-বীন থেকে ফাদার ইশপ উদ্ধার করেছিলেন। অতসীও সেটা জানে না। অরফেন হোমের নিয়ম, প্রত্যেককে বলা—তোমাদের বাবা, মা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাজে তোমাদের সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

এ নিয়ে কতদিন শান্তনুকে ছেলেমেয়েদের বেয়াড়া বেয়াড়া প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তা বলে আমরা বাবা, মার ফটোও দেখতে পারব না ?

শান্তনু বোঝাত—তার চাইতেও বড় জিনিসের ফটো তো তোমাদের ঘরে রয়েছে।

ঐ দেখ।

শান্তনু দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙান, যীশু, বৌদ্ধ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

তারা আপাততঃ শান্ত হত।

ফাদার ইশপের এ টেকনিক্‌টা শান্তনুর খুব ভাল লেগেছিল। ইচ্ছে করে তিনি সবাইকে একভাবে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করেন নি। কাউকে হিন্দু, কাউকে মুসলমান, কাউকে খৃষ্টান, কাউকে বাঙ্গালী কাউকে বা মারাঠী বলে পরিচয় দিয়েছেন। বড় হয়ে তারা অন্ততঃ বুঝতে পারবে, কার বাবা মা কেমন ছিলেন।

ফাদার ইশপ আজ নেই। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত অরফেন হোমে আর কোন অন্যায় শান্তনু ঢুকতে দেবে না।

মিস্ রমানাকে দেখে শান্তনুর সেই আশঙ্কাই হয়েছিল। য়্যুনিভার্সিটিতে অনেকদিন অতসীকে তার সাথে ঘুরতে দেখেছে। তখনই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। য়্যুনিভার্সিটিতে মিস্ রমানার প্রতিপত্তির কথা ভেবে শান্তনু কিছু বলে নি।

কিন্তু অরফেন হোমে প্রবেশের পূর্বে শান্তনুর অনুমতি নিশ্চয় নেওয়া দরকার।

না, ঘটনা বেশীদূর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। শান্তনু একটু উত্তেজিত হয়ে শকুন্তলার ঘরে ঢোকে। শকুন্তলা নিবিষ্ট মনে নিজের টেবিলে বসে কি যেন লিখছিল। মুখ না তুলেই বলে,—

পারমিসন না নিয়েই ঘরে ঢুক্‌লে যে?

শান্তনু শকুন্তলার গাম্ভীর্যে মনে মনে না হেসে পারে নি। বেশ ভালও লাগল তার এই—একাগ্রতা। একটু কৃত্রিম সুরে বলে,—

নো, ম্যাডাম্, আই এ্যম নট এ স্টুডেণ্ট। অবশ্য আপনার পারমিসন নিয়ে আমারও ঢোকা উচিত ছিল।

কে? আপনি?

শকুন্তলার কণ্ঠে বিস্ময়। মনে কিছুটা রোমাঞ্চ। শান্তনু তো এমন অসময়ে কোনদিন আসে না।

শকুন্তলা নিজেকে সংযত রাখতে পারে না।

তা, আপনি এই অসময়ে?

হ্যাঁ, একটা জরুরী দরকারে?

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

না, বসব না, মিস্ শকুন্তলা। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।

শকুন্তলার বিস্ময়, ভয় দুই-ই হয়।

কি কথা?

মিস্ রমানা এসেছিলেন কেন ?

এক বছর হল শকুন্তলা এই অরফেন হোমে এসেছে। এর মধ্যে কোনদিন শান্তনু তার কোন কাজের কৈফিয়ৎ তলব করে না। বুঝতে পারে শান্তনুর বিশ্বাস ভাঙার সময় হয়েছে।

একটু আহত কণ্ঠে বলে—তা আপনিই বা গোয়েন্দাগিরি করতে গেলেন কেন ?

গোয়েন্দাগিরি ? কি বলছেন মিস্ শকুন্তলা ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এরকম প্রশ্ন করা গোয়েন্দাগিরি ছাড়া আর কি বলতে পারি বলুন, শান্তনুবাবু ?

শকুন্তলার আহত কণ্ঠে শান্তনু লজ্জা পায়—না আমি অমন কিছু মীন করে বলি নি। আসলে মিস্ রমানা সম্বন্ধে লোকে অনেক কথাই বলে কিনা ?

শকুন্তলা একটু ভৎর্সনার সুরে বলে,—

লোকের কথায় বিশ্বাস করলে, কাজ করা যায় না শান্তনুবাবু। লোকে তো আমার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলত।

আই এ্যাম সরি শকুন্তলাদেবী। আপনার যা ভাল মনে হয় করুন।

একি চল্লেন নাকি ? আপনি কি এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করতে এই অসময়ে এসেছিলেন।

শকুন্তলা সহজ হবার চেষ্টা করে।

আপনার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত এটা আমার কাছে সামান্য প্রশ্ন ছিল না।

শকুন্তলার উত্তরের অপেক্ষা না করে শান্তনু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শান্তনু চলে গেলে শকুন্তলা ভাবতে থাকে। না আর দেরী করা চলবে না। শান্তনু সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। যেমন

করেই হোক তাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। হ্যাঁ, পূর্ণ প্রতিশোধ। শান্তনুকে ও অনেক স্কোপ দিয়েছে, নিজেকে ঠিক করার। ওর মনের মত ভাষা শিখেছে শকুন্তলা, আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছে, নিজের সমস্ত হ্যাবিটগুলো চেঞ্জ করেছে। এর জন্য কম কষ্ট স্বীকার করতে হয় নি। আজ এমন অসময়ে আসতে দেখে ভেবেছিল—শান্তনু বুঝি বা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। না পারে নি। না শান্তনুকে আর সে এর চাইতে ভালভাবে কিছু বলতে পারবে না। এখনও সময় ছিল, আজ রাতের যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা এড়ানোর। না কোন উপায় নেই। শান্তনুর সেদিনের ব্যবহার শকুন্তলা কখনই ভুলতে পেরেবে না। রিভেঞ্জ, রিভেঞ্জ এ্যাট এনি কস্ট! এর কোন ক্ষমা নেই।

ক্ষমা সে কাউকে করবে না, রাজাগোপালন নয়, অর্দ্ধেন্দু নয়, মিস্ রমানাকেও নয়। রাজাগোপালনের লালসা দেখে শকুন্তলার ঘৃণা হয়েছে। নিজে গোল্লায় গেছে, সেই সাথে অর্দ্ধেন্দুও। কাল আবার টাকা চাইতে এসেছিল। শকুন্তলা দেয় নি। জোর করে তার থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে গেছে। এত বড় আস্পর্ধা। আজ রাতেই হয়ত আসবে চুরি করতে। মাতাল অর্দ্ধেন্দুটাও আসবে নিশ্চয় বনলতার ঘরে। বাঃ, বেশ মজা তো। আর শকুন্তলা সব চেয়ে চেয়ে দেখবে, অসম্ভব। সব শোধ সে একদিনে তুলবে। মিস্ রমানাকে ছাড়বে না।। দিনে দিনে আঙুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে মজা লোটা হচ্ছে। লিসা আর অতসীকে সে তার কোন প্রফেসর বন্ধুর বাড়ীতে রেখে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেবে। দরদ একেবারে উথলে উঠছে। এতই যদি উপকার করার ইচ্ছে তাহলে তাদের পরিবর্তে দুহাজার টাকা ডোনেসন দেবার প্রস্তাব কেন! অরফেন হোম কি মেয়ে বিক্রীর জায়গা নাকি? শকুন্তলা ভাবতে পারে না। আর দেরী করা উচিত হবে না। যা করার প্রয়োজন, এখনই করতে হবে।

ইমিডিয়েট। শান্তনুর মনেও যখন একটা খট্‌কা লেগেছে, আর বেশীদিন চলা নিরাপদ নয়।

শকুন্তলার আশ্চর্য লাগে। কত সহজেই শান্তনু তাকে বিশ্বাস করল। না শুধু আজই নয়। সেই সেদিন, যেদিন তার কাছে খাঁটি বাঙালী সেজে গিয়েছিল, সেদিন থেকেই বিশ্বাস করেছে। শকুন্তলা বুঝতে পারে না, শান্তনু চালাক না নির্বোধ, ছোট না বড়, সাধারণ না অসাধারণ। শান্তনু শকুন্তলার জীবনে একটি ব্যতিক্রম।

ইভামাসি নায়নার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন,

হ্যাঁ কোহলী ঠিক বলেছে, তুমি মিঃ আর মিসেস্ টেলরের মেয়ে নও।

মাসি, এ কথাটা তুমি আমায় কোনদিন বল নি কেন? নায়নার কণ্ঠ খুবই ক্ষীণ। প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও যেন নেই।

জীবনে প্রথম ইভামাসির চোখে নায়না জল দেখল। তোমার যে এমন হবে, সে কথা কি জানতাম। ছোটবেলায় তোমাদের নিয়ে কত কষ্ট করেছি। তোমাদের জন্য মীরাট ছেড়ে এলাহাবাদে এসেছি। ভেবেছিলাম তোমাদের দু-জনের মুখের পানে চেয়েই পাপের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করে যাব। হল না নায়না, হল না। সত্য এমনই কঠিন। কখনও তা অপ্রকাশিত থাকে না।

ইভামাসির এতদিনের রুদ্ধ অশ্রু নীরবে ঝরে পড়তে থকে দু-চোখ দিয়ে।

নায়না ইভামাসির খাটের উপর শুয়েছিল একটা বালিশে মাথা রেখে। মাসিকে চুপ করে থাকতে দেখে উঠে বসে।

বল মাসি, আর থেম না। সত্য আর গোপন কোর না। বল আমি কি ক্রিশ্চিয়ান নই?

না, তুমি ক্রিশ্চিয়ানের ঘরে লালিত পালিত। কিন্তু তোমার শরীরে বাঙ্গালীর রক্ত।

বাঙ্গালীর রক্ত! নায়নার মুখ দিয়ে আপনা হতেই কথাটা বেরিয়ে পড়ে।

শোন নায়না, আজ তোমায় সব কথাই বলছি। কিছুই গোপন করব না।

ইভামাসি দৃঢ় গলায় বলতে থাকেন,—

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে, মীরাটের এক ম্যাটারনিটি হোমে একটি সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ে এসে ভর্তি হয়। নাম উর্মিলা গুহঠাকুরতা। কোন সন্দেহ না করে সাধারণ নিয়ম অনুসারেই তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছিল।

আমি ছিলাম সেই হাসপাতালের নার্স, মিঃ টেলর সুপারিনটেনডেন্ট।

কিন্তু কে জানত বিধির বিধি এমন হবে! দ্বিতীয় দিনে ভদ্র-মহিলার একটি মেয়ে হয়। বাড়ির কোন লোকজন আসছে না দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনার স্বামী যে আজও এলেন না। আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কাল আসবেন, তিনি অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছেন কিনা।

পরের দিন সেই ভদ্রমহিলাকে আর বেডে দেখা যায় নি। তিনি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন।

নায়না চাপা আর্তনাদের সুরে ইভামাসির একটা হাতে চাপ দিয়ে বলে—আর সেই মেয়েটি।

ইভামাসি একটু মলিন হাসি হেসে বলেন,—

বেঁচে গেল। সরকারি নিয়ম অনুসারে তাকে অরফেন হোমে পাঠিয়ে দেবার কথা। কিন্তু মিঃ টেলর তা করতে দিলেন না। মিঃ আর মিসেস্ টেলর ছিলেন নিঃসন্তান। ফুটফুটে

ছোট মেয়েটিকে তারা নিতে চাইলেন দত্তক হিসাবে। কিন্তু সরকারী আইন অন্য রকম। যতদিন না প্রমাণ হচ্ছে মেয়েটি অনাথ ততদিন সরকারের প্রথম কাজ সেই শিশুকে তার বাপ, মার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া। মিঃ টেলর মেয়েটিকে চুরি করলেন।

নায়নাও অস্ফুটস্বরে বলে—

চুরি করলেন।

হ্যাঁ নায়না, তাও আমারই সাহায্যে। আমিই তোমায় সেদিন, ছোট ছোট কতকগুলি শিশুর মধ্যে থেকে তুলে এনেছিলাম নায়না। অনাথ হয়ে বাঁচার চাইতে কোন একটা আশ্রয়ে থাকা অনেক ভাল। তখন কি জানতাম নায়না অনাথ আশ্রমেই তুমি সুখে থাকতে।

নায়না স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে ইভামাসির কথা।

ইভামাসিরও চোখের জল শুকিয়ে গেছে। তিনি বলতে থাকেন,—

পুলিশের ভয়ে আমরা মীরাট ছাড়লাম। এই এলাহাবাদে এলাম। এখানেই তুমি আর শান্তনু বড় হলে, স্কুলে গেলে, কলেজে গেলে।

শান্তনুর কথায় নায়নার মৌনতা ভঙ্গ হয়। আচ্ছা মাসি, শান্তনু জানত আমার বাবা, মা নেই?

জানত।

কোনদিন আমায় বলে নি কেন?

তুমি কষ্ট পাবে বলে।

মাসি? কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ ঠিকই বলছি, হয়ত তোমারই কথা ভেবে ও আমায় বলত—জান মাসি আমি অরফেন হোমের সমস্ত ছেলেমেয়েদের বাবা, মাকে খুঁজে বার করব।

মাসি?— নায়না নিজেকে সংযত রাখতে পারেনা। ইভামাসির কোলে মাথা রেখে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ইভামাসি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

সত্য এমনই কঠিন নায়না।

কিছুক্ষণ বাদে নায়না মুখ তুলে তাকায় ইভামাসির দিকে—

মাসি ?

বল।

তুমি বলেছিলে শান্তনুর মা, বাবার ফটো আমাদের দেখাবে। সেটা আছে তোমার কাছে ?

না।

কেন ?

কোনদিনই যে ছিল না।

তাহলে তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে। নায়নার চোখে বিস্ময়।

হ্যাঁ, শান্তনুর বাবা, মা এখনও যে জীবিত।

জীবিত! নায়না এত শোকের মধ্যেও চমকে ওঠে।

কোথায় তারা ?

এবার ইভামাসি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এমন করে আমায় আর আঘাত কোর না নায়না। আমি আর পারছি না। আমিই শান্তনুর মা।

তুমিই শান্তনুর মা ? আর বাবা ?

মিঃ টেলর। উঃ আর পারছি না। ইভামাসি দুই হাতে মুখ ঢাকেন।

নায়নার উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কাঁপতে থকে—

মাসি! শান্তনু জানে তুমি তার মা ?—

না, না, নায়না, দোহাই তোমার, এ কথা তাকে কোনদিন বোল না।

ইভামাসি আর কথা বলতে পারেন না। কে যেন তাঁর গলাটা চেপে ধরেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, শোন নায়না, তোমার মা আজও জীবিত আছেন। আমি চিনতে পেরেছি। ভুল হয় নি। কোন-

দিন তার কাছে যেও না। চিনতে পারবেন না। তিনি যে খুব নামকরা লোক। সমস্ত এলাহাবাদ তাঁকে চেনে।

নায়না অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, উর্মিলা গুহ ঠাকুরতাকে তো কেউ চেনে না।

ইভামাসির চোখ দুটো জ্বলে উঠে, না, উর্মিলা গুহ ঠাকুরতা নয়, মিস্ রমানা।

পনের

ইশপস্ অরফেন হোমের বাইরে লেনের বড় অলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে শান্তনু তার ঘরে ঢুকল। ফাদার ইশপের মৃত্যুর পর শান্তনু তার ক্যানটনমেণ্টের বাড়ী ছেড়ে এই অরফেন হোমে চলে এসেছে। সে প্রায় বছর দুই হবে। ঠিক রাত নটার সময় শকুন্তলা চলে গিয়েছে।

শান্তনু তাকে বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে দিয়ে এসেছিল। প্রায় বাস স্টাণ্ডের কাছাকাছি। শকুন্তলা কোন দিন এরকম অনুরোধ করে না। রাস্তায় যেতে যেতে বলেছিল, আজ রাতটা একটু সাবধানে থাকবেন?

শান্তনু বিস্মিত হয়ে বলেছিল—কেন বলুন তো?

শকুন্তলা বলেছিল—আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে আজ রাতে অরফেন হোমে কোন গণ্ডগোল হতে পারে।

কি গণ্ডগোল?

শকুন্তলা অকটু অনুরোধ করে বলেছিল,

কতদিন আপনাকে বলেছি নিজের সাথে এত টাকা রাখবেন না। শোনেন নি। এত টাকা কেউ কাছে রাখে? এর চাইতে ব্যাঙ্ক অনেক নিরাপদ।

শান্তনু হেসে বলেছিল,

ওঃ, তাই বলুন। টাকা তো আর আজ প্রথম রাখছি না অনেকদিন ধরেই রেখে আসছি। কিছু হবার হলে এরই মধ্যে হত। আর তাছাড়া চাবি তো আপনার কাছেই রেখেছি। চাবি ছাড়া আমার ঘরের আয়রণ সেল্‌ফ খোলা চোরের বাবারও সাধ্য নেই। আর আমাকে খুন করলেও চাবি পাবে না।

খুন কথাটা শুনে শকুন্তলা চম্‌কে ওঠে। ভীষণ ভয় করতে থাকে। রাজাগোপালনকে বিশ্বাস নেই। ও সব করতে পারে।

শান্তনু অন্ধকারে শকুন্তলার সে ভাবান্তর লক্ষ্য করে নি। শকুন্তলা নিজেকে সংযত করে বলেছিল,

কথা দিন, আজ রাতটা একটু সাবধানে থাকবেন।

শান্তনু শকুন্তলার আন্তরিকতায় অবাক হয়েছিল। তার জন্যও কেউ ভাবে জেনে একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল।

শান্তনু বলেছিল, বেশ কথা দিলাম।

ঘরে ঢুকে শান্তনুর বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। কেন শকুন্তলা তাকে আজ সাবধানে থাকতে বলেছে। শান্তনুর চিন্তা বাড়তে থাকে। শকুন্তলার কাছে বিকেলে মিস্ রমানার আসাটাও শুভ নয়।

শান্তনু অনেক্ষণ জেগে বসে রইল। বাইরে অরফেন হোমের বড় ওয়াল ক্লক্‌টায় টং, টং, করে রাত বারটার ঘণ্টা পড়ল। ঘুমে শান্তনুর চোখ বুঁজে আসছিল। ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে ভাল করে বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে শান্তনু শুয়ে পড়ে। না ভয়ের কিছু নেই। চোর আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে আসা অসম্ভব, খুব শক্ত গ্রিল দেওয়া।

শান্তনুর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খুট্ করে একটা আওয়াজে শান্তনুর কান দুটো উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিসের শব্দ? কে যেন সন্তর্পণে দরজার একটা ছিটকিনি খুলল। আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা। সমস্ত অরফেন হোম শান্ত। বাইরে মস্ত

গেটের নীচে দারওয়ান থাপ্পা বাহাদুরের পায়চারির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। না কিছু না। শান্তনু অযথাই ভয় পেয়েছিল।

আবার সেই শব্দ, এবার খুব কাছে। ঠিক তার ঘরের সাথে লাগা বাথরুমের দরজায়। শুতে যাবার আগে শান্তনু তো বাথরুমে গিয়েছিল। কেউ ছিল না। বাথরুমের জানলায় অবশ্য গ্রিল নেই। সেজন্য জানালাটা প্রথম দিন থেকে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছিল। তবে কি বাথরুমের দরজাটা কেউ ভিতর থেকে খুলে রেখেছিল ?

সুইপার আসার জন্য বাথরুমের সাথে লাগান দোতলায় ওঠার জন্য একটা লোহার ঘোরান সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা কারুর পক্ষে অসম্ভব নয়।

জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের লনের আলোটা এসে বাথরুমের দরজায় পড়েছে। শান্তনু স্পষ্ট দেখতে পেল—বাথরুমের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। শান্তনুর মনে ভয়ের চাইতে কৌতুকটাই হয় বেশী। সত্যি চোরের মত চুরি করাই বটে। দরজা খোলার নমুনা দেখেই মনে হয় চোরও খুব সতর্ক। শান্তনু নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকে খাটের উপর।

একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। একি রাজাগোপালন! শান্তনু বিস্মিত হয়। হঠাৎ মনে হয় শকুন্তলা তার সাথে ঠাট্টা করেছে। রাত্রে রাজাগোপালনকে পাঠিয়ে একটু ভোড়কে দেওয়া। শান্তনুর নেহাৎ মন্দ লাগছিল না রাজা-গোপালনের চোরের অভিনয়টা। একি, রাজাগোপালন সত্যিই চুরি করবে নাকি ? রাজাগোপালনকে সন্তর্পণে সেল্‌ফের চাবি খুলতে দেখে শান্তনু অবাক হয়। চাবি পেল কি করে।

রাজাগোপালন এত অধঃপাতে গেছে। শান্তনু কল্পনাও করতে পারে না। সেই রাজাগোপালন, এলাহাবাদ য়্যুনিভার্সিটির কৃতিছাত্র। একদিন শান্তনুকে বলেছিল—চাকুরী না পেলে

কিছুতেই রিসার্চ করবে না। কে দেবে তাকে টাকা? শান্তনু টাকা দেবে বলেছিল বলে—সে অম্লান বদনে তা অস্বীকার করেছিল। বোধহয় তার প্রেস্‌টিজে লেগেছিল। শুধু বলেছিল—য়্যুনিভার্সিটিতে আমার একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পার। না শান্তনু পারে নি, বহু চেষ্টা করেও পারে নি।

রাজাগোপালনের জন্য শান্তনুর গর্ব অনুভব হয়। যাদের টাকা আছে তারা যখন ওকে কিছু দিতে পারে নি, অবশ্যই ছিনিয়ে নেবে। হ্যাঁ, এ টাকায় তার অধিকার আছে নিশ্চয়। অজান্তেই শান্তনুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে দুটি কথা—ঠিক আছে রাজাগোপালন, ঠিক আছে? ছাটস্‌ রাইট!

কে? রাজাগোপালন চম্‌কে ওঠে। চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় শান্তনুর দিকে। শান্তনু ততক্ষণে বেড্‌সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

হ্যাঁ রাজাগোপালন, তুমি ঠিক করছ। হাত পাত্‌লে যখন টাকা পেতে না, অবশ্যই ছিনিয়ে নেবে বই কি। এতো তোমাদেরই টাকা।

রাজাগোপালন শান্তনুর আচরণে অবাক হয়। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে?

ডোন্‌ট প্লে ট্রিকস্‌ শান্তনু। তোমার বুলি আউড়ে আমায় দুর্বল করে দিও না। নো, আই ডোন্‌ট ওয়ানট্‌ এনি মার্‌সি।

শান্তনু শান্ত কণ্ঠে বলে,—

হ্যাভ নো সেন্স্‌ অব ডিগ্রেডেসন ইন ইউ, রাজাগোপালন। তোমায় দেখে আমার চোখ খুলেছে। রাজাগোপালন, বল্‌তে পার আমি কাদের জন্য এ টাকা রেখেছি? তুমিও তো কম অরফেন নও। এরা অসমর্থ হয়ে অরফেন। তোমার জ্বালা যে এদের চাইতেও বেশী। তুমি সমর্থ হয়ে অরফেন। এরা বাবা, মা হারিয়ে অরফেন। তুমি দেশের লোকের সহানুভূতি হারিয়ে অরফেন।

আজ আমার অরফেন হোমের ছেলেমেয়েরাও যে তোমার চাইতে সুখী। অন্ততঃ তাদের নিজেদের একটা জগৎ আছে। তোমার তো তাও নেই। ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমার এখানে একটা ক্লার্কের চাকুরী দিতে পারতাম।

বলতে বলতে শান্তনু উঠে এসে রাজাগোপালনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে,

কিন্তু তুমিই বল রাজাগোপালন, নিজে ডি. এস. সি হয়ে কেমন করে আমি এম. এস. সির অবমাননা করি। যে দেশে সরকার নিজেই অরফেন, সেখানে এ তৃষ্ণা মেটায় কার সাধ্য।

রাজাগোপালন বিশ্বাস করতে পারে না শান্তনুকে, বলে—

আমার জন্য দেখি তোমার দরদ্ উথ্‌লে উঠছে? আমার এ পরিণতির জন্য তুমিও কম দায়ী নও শান্তনু?

কেন?

তুমি কি আমার জন্য য়্যুনিভার্সিটিতে চেষ্টা করেছিলে।

করেছিলাম।—শান্তনুর দৃঢ় উত্তর।

করেছিলে?

হ্যাঁ।—

তাহলে আমার চাকুরী কেন হল না শান্তনু?

শান্তনু গম্ভীর গলায় বলে,

সাউথ ইণ্ডিয়ানদের বোধ হয় আর কোনদিন এদিকে চাকুরী হবে না।

অরফেন হাউসের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পুলিশের সুতীব্র হুইসেলের আওয়াজ শান্তনু আর রাজাগোপালন—দুজনকেই হকচকিয়ে দেয়।

রাজাগোপালন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকায়,—শান্তনু! পুলিস!

শান্তনুর মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটা কথাই বেরিয়ে পড়ে—

কেমন করে জানতে পারল ?

তুমি বোস রাজাগোপালন, আমার খাটে। আমি দেখছি কি ব্যাপার।

শান্তনু ঘর থেকে বেরোতেই এলাহাবাদ ক্যানটনমেণ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত ও, সি, মিঃ চৌবেকে দেখতে পেল। মিঃ চৌবেকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। শান্তনুকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে,

আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম শান্তনুবাবু। কি যাতা সব শুনছি আপনার অরফেন হাম সম্বন্ধে ?

শান্তনু মুচকি হেসে বলে, অরফেন হোম সম্বন্ধে ভাল কথা কবে শুনেছেন বল্‌তে পারেন ?

শান্তনুর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। মিঃ চৌবে সেটা বুঝতে পেরে বলে,

অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করায় খুবই লজ্জিত। কিন্তু কমপ্লেনটা যে আপনারই লোক করেছে।

আমার লোক ? শান্তনু বুঝতে চেষ্টা করে।

হ্যাঁ, আপনি জানেন না ? আজ বিকেলেই পেয়েছি। অরফেন হোমে ক্রমেই নাকি চুরির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে সব উচ্ছন্নে যাচ্ছে, শেষকথাটা আর নাই বা শুন্‌লেন। আপনি নাকি সমস্ত জেনেশুনেই সহ্য করে যাচ্ছেন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্য আর কিছুর নয়—নিষ্ক্রিয়তার।

শান্তনুর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু একটি কথাই বেরিয়ে আসে, স্ট্রেঞ্জ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে,

কমপ্লেন্‌টা কে করেছে, বলতে পারেন ?

মিঃ চৌবে দৃঢ় গলায় বলেন,

খুব পারি। একথা বলতেই তো এসেছি। আপনারও তো একটা জবানবন্দী চাই। কমপ্লেন তো আর বাইরের লোক কেউ

করে নি। করেছেন আপনারই লোক। আপনার হোমের গভরনেস মিস্ শকুন্তলা।

শকুন্তলা।

হ্যাঁ আপনি অত বিস্মিত হচ্ছেন কেন শান্তনুবাবু? সত্যি বলুন তো রাজাগোপালন বলে কেউ কি এসেছিল আপনার কাছে?

মিঃ চৌবের প্রশ্নের ঢং দেখে শান্তনুর বুঝতে বাকি থাকে না—কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। শান্তনু বুঝতে পারে না, শকুন্তলা কেন এমন করল। ভাব্‌বার তখন সময় নেই, শান্তনু তাড়াতাড়ি বলে—

এসেছিল নয়, এসেছিলেন বলুন। রাজাগোপালন আমার বন্ধু, আমিই তাকে আসতে বলেছি।

কেন?

সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দেব?

শান্তনুর গলায় রীতিমত ধমকের সুর।

উনি কি এখনও আছেন আপনার ঘরে?

হ্যাঁ। আমিই তাকে বসতে বলেছি।

এত রাত্রে?

বললাম তো সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দেব না।

তাকে যে আমার সঙ্গে যেতে হবে, শান্তনুবাবু। তার নামে এ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে।

হোয়াই? শান্তনুর কণ্ঠের দৃঢ়তায় মিঃ চৌবেও অবাক হয়।

কারণ সে চোর, চুরি করতে এসেছে আপনার এখানে।

সাট আপ্‌ মিঃ চৌবে। শান্তনু গর্জে ওঠে।

আপনি কার সাথে কথা বলছেন জানেন? আমি অরফেন হোমের সুপারিনটেনডেন্ট শান্তনু গুপ্ত বলছি, রাজাগোপালন চুরি করতে আসেন নি। আমার আনডারে যে চাকুরী করে সেই

গভরনেস মিস্ শকুন্তলা কি বলেছে না বলেছে আমি বুঝব, রাজা-গোপালন নয়।

হঠাৎ রাজাগোপালন শান্তনুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, না, না, মিঃ চৌবে, শান্তনু আমাকে বাঁচাবার জন্য এমন কথা বলছে। আমি চুরি করতেই এসেছিলাম। না, না, চুরি—না আমি আমার পাওনাটা বুঝে নিতে এসেছিলাম। আপনারা বলবেন চুরি।

রাজাগোপালন মিঃ চৌবের দিকে হাত-দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলে—

আমায় এ্যারেস্ট করুন, মিঃ চৌবে।

শান্তনু বাধা দিয়ে বলে,

কি হচ্ছে রাজাগোপালন? তোমার মাথার ঠিক নেই দেখছি।

রাজাগোপালন অনুনয়ের সুরে বলে—

প্লীজ শান্তনু, ডোন্‌ট শো মি এনি মারসি।

পার তো অর্দ্ধেন্দুকে বাঁচাও।

অর্দ্ধেন্দুর কথা শুনে শান্তনু চম্‌কে ওঠে।

অর্দ্ধেন্দু? কোথায় অর্দ্ধেন্দু?

বনলতার ঘরে।

বনলতার ঘরে? কেন?

আমি আর কিছুই বলতে পারব না শান্তনু। সব মিঃ চৌবে জানেন। শকুন্তলাকে পেলে একবার দেখে নিতাম।

মিঃ চৌবে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, দেখলেন তো শান্তনুবাবু, যা শুনেছি সব সত্যি। অর্দ্ধেন্দুকেও বোধহয় এতক্ষণে আমার লোকেরা হাতে নাতে ধরে ফেলেছে।

আচ্ছা আসি গুড্ নাইট। কাল সকালে একবার ডিসটারব করতে আসব। আপনার বক্তব্য ভেবে রাখবেন। একটা জবানবন্দী তো দরকার হবে।

শান্তনু কোন কথা বলতে পারে নি। পুতুলের মত চুপ

করে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত অরফেন হোম তখন জেগে গিয়েছে। মেয়েদের কান্নায়, ছেলেদের আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছে অরফেন হোম। শান্তনুর কানে তা যায় নি। রাজগোপালন, অর্দ্ধেন্দু আর বনলতাকেও বোধহয় পুলিশের ভ্যান নিয়ে গেল। শান্তনু কিছু বলে নি।

তার মনে শুধু একটি চিন্তা, কেন এমন হল? কেন শকুন্তলা এমন করে অরফেন হোমের সর্বনাশ করল?

শান্তনু যতটা ভেবেছিল শকুন্তলা ততটা অকৃতজ্ঞ নয়। এর একটা জবাব শকুন্তলা দিয়ে গিয়েছিল বৈকি।

পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত শকুন্তলা না আসাতে শান্তনু নিজেই গিয়ে হাজির হয়েছিল তার অফিস ঘরে—এর একটা উত্তরের আশায়। শান্তনু উত্তর পেয়েছিল—শকুন্তলার মুখে নয়, ভাষায়। টেবিলের উপরই শকুন্তলার চিঠিটা পড়ে ছিল।

শান্তনু,

আমার উপর তোমার খুব রাগ হচ্ছে বুঝি? ভাবছ, মেয়েরাও এমন অভিনয় করতে পারে? এমন বিশ্বাসঘাতক হতে পারে?

না, তোমার সে ধারণা ভুল, শান্তনু। মেয়েরা তাদের বিশ্বাসের আশ্রয় খোঁজে, প্রশংসা চায় না। মেয়েরা চায় নির্ভরতা, স্বাধীনতা নয়। ভেবে দেখো, মারিয়াই কি তা পেরেছিল?

পুরুষের কাছে সেটা না পেলে, তাকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া সব মেয়েরই কর্তব্য। নায়না যা পারে নি, আমিই তা করে গেলাম।

আর একটা কথা শান্তনু। তোমায় আমি ভালও বেসেছিলাম। কেন জান? আমার চরিত্র জানা থাকা সত্ত্বেও তুমি আমায় বিশ্বাস করেছিলে।

শকুন্তলা।

ষোল

শান্তনু ছয়মাস পর আবার তার অরফেন হোমের অফিসে এসে বসল। আদালতের হুকুমে এই ছয়মাস কাজকর্ম একপ্রকার বন্ধ ছিল। ডোনেশন্ নেওয়া বন্ধ, পরিত্যক্ত শিশু তুলে আনা নিষেধ। এমন কি, বহু হাসপাতাল থেকেও এ ধরণের কেস আসা বন্ধ করে দেওয়া হয় সরকারী নির্দেশে।

হোমের দশ বছরের বেশী বালক-বালিকাদেরও নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরকারী উদ্ধার আশ্রমে। আরেকবার অনাথ করবার জন্য।

অতসী আর লিসাকে ভালভাবে মানুষ করবে বলে মিস্ রমাণা নিয়ে গিয়েছেন। শান্তনু প্রতিবাদ করেও পারে নি। মিস্ রমাণার ইনফ্লুয়েনস্ সমস্ত এলাহাবাদে তার চাইতে অনেক বেশী। বনলতা এখনও পুলিশ হাজতে। ভাগ্যে কি আছে শান্তনু জানে না। এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনার কথা যে, অরফেন হোমের কেলেঙ্কারীর কথা শুনে অন্ততঃ একজন দরদী মানুষ তার উদার মনের পরিচয় দিয়েছে। এক মোটর মেকানিকস্ বিয়ে করেছে, এমিলিকে। সমাজিক ভাবে তাকে স্ত্রী বলে মেনে নিয়েছে। এমিলি বিয়ে করতে চায় নি। শান্তনুকে কেঁদে এসে বলেছিল—অরফেন হোমের হিউটাকে সে ভালবাসে। শান্তনু সে বিয়েতে বাধা দিতে পারে নি।

কারণ,—সমাজের রায় হয়েছিল—এটা ভালবাসা নয়, নোংরামি। এই ছয়মাস কোর্ট-কাছারি আর বড় বড় লোকের বাড়ি ঘোরাঘুরি করে শান্তনু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত আদালতের রায়টা সে নিজের অনুকূলে নিতে পারে নি। ঠিক হয়েছে, দশ বছরের অনূর্দ্ধ বালক-বালিকারাই শুধু ইশপস্ অরফেন হোমে স্থান পাবে। এর মধ্যে যাদের কোন ব্যবস্থা

হবে না—তারা সবই যাবে সরকারি উদ্ধার আশ্রমে। সরকারই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন, শান্তনু নয়।

জাজসাহেবের রায়টা এখনও শান্তনুর কানে বাজছে—শান্তনু গুপ্তের মত একজন আদর্শবান যুবকের তত্ত্বাবধানে থাকা সত্ত্বেও অরফেন হোমের এই দুর্গতি—সমাজের এক ভয়াবহ চিত্র ছাড়া কিছুই না। তথাপি আদালত শান্তনু গুপ্তের কথা স্মরণ করেই অরফেন হোম একদম তুলে দিল না। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এমন আর হবে না।

শান্তনুর ইভা মাসির কথা মনে পড়ে। বলতেন,

তুই কি মনে করিস অরফেন হোমের ছেলেমেয়েদের মানুষ করবি? তুই নিজেই মানুষ হলি না, তো তাদের মানুষ করবি কি করে? তুই ভারি অপদার্থ, নিজে ভাল ফল করতে পারিস নি বলে, নায়নার সাফল্যটা স্বীকার করতে পারলি না। যার এত কমপ্লেক্স, সে অপরের ভাল করবে কি করে?

মনে পড়ে ফাদার ইশপের কথা। বলতেন,—

আমার কাছে এদের বাঁচিয়ে রাখাই বড় কথা শান্তনু, মানুষ করা নয়। মানুষ কি কেউ কাউকে করতে পারে? মানুষ নিজে নিজেই মানুষ হয়। এরাই দেখ দশ বছর পরে কেমন পাল্টে যেতে থাকে। এমন সহজ সরল থাকে না। তখন সরকারি উদ্ধার-আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়াই মঙ্গল।

শান্তনু তীব্র প্রতিবাদ করত,

কি বলছেন ফাদার—যাদের প্রাণ দিলেন, তাদের মানুষ না করতে পারলে যে সমাজের কাছেই অপরাধী হতে হবে।

ফাদার ইশপ হাসতে হাসতে বলতেন,

না শান্তনু, ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে সে ভয় থাকে না। যদি পার এই দশ বছরে একটু ঈশ্বরে ভক্তি এদের শিখিয়ে দিও। দেখবে তাতেই হবে। জান তো আমাদের কোন শিক্ষাই মানুষ হবার

শিক্ষা নয়; ঈশ্বরে ভক্তিই একমাত্র শিক্ষা যা মানুষকে মানুষ করে। দশ বছর অবধিই এই শিক্ষা দিয়ে তাদের আবার সেই ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করা আমাদের কর্তব্য।

শান্তনু মানতে পারত না, ফাদার ইশপের কথা। সাইকোলজী তিনি পড়েন নি বলে এমন কথা বলছেন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে ফেলতে পারলে অসাধ্য-সাধনও সম্ভব। আর অরফেন হোমে সেই সুযোগ সব চাইতে বেশী। চব্বিশ ঘণ্টা একই পরিবেশে তারা থাকে বলে—এদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা অনেক সুবিধা; শান্তনু তাই করেছিল। ফাদার ইশপের আপত্তি সত্ত্বেও, দশ বছরের পরে কাউকে উদ্ধার-আশ্রমে পাঠায় নি। এখানে থেকেই—স্কুল কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

মৃত্যুর দিন ফাদার ইশপ শান্তনুকে বলেছিলেন, জান শান্তনু, সমাজ যাদের জন্য কিছু করল না। উল্টে শুধু অবহেলা ঘৃণা, বিদ্বেষই দিল, সমাজের একটু ক্ষতি করার অধিকার তাদের আছে বইকি। এটাও যে ঈশ্বরের নির্দেশ। আশীর্বাদ করি শান্তনু তুমি যেন এ নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পার। ঈশ্বর তোমায় সে ক্ষমতাই দিক। অফিস ঘরের দেওয়ালে টাঙান ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে শান্তনু সে কথাই ভাবছিল। বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—সব কটাই কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু তাঁদেরই মাঝে ফাদার ইশপের বড় পোট্রেটটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তিনি যেন জীবন্ত। বেঁচে থাকতে তিনি কোন দিন তাঁর এ ফটো এখানে টাঙাতে দেন নি। মৃতুর পর শান্তনু নিজে এটা টাঙিয়ে দিয়েছিল।

তিনি যেন বলছিলেন,

শান্তনু ঈশ্বরের নির্দেশ যে তিনি নিজেও লঙ্ঘন করতে পারেন না। আইনকারীকে যে সবচেয়ে আগে আইন মানতে হয়।

শান্তনু দুই হাতে মাথা গুঁজে টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে।

তার মনে তখন অনেক ভাবনা। চেষ্টা করেও কিছু হয় না। চেষ্টা করে সে অরফেন হোমের উন্নতি করতে পারে নি। চেষ্টা করে অর্দ্ধেন্দু, রাজাগোপালন চাকুরী পায় নি। এমন কি চেষ্টা করেও সে অর্দ্ধেন্দু ও রাজাগোপালনকে জেলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কারণ চেষ্টা করেও রাজাগোপালন মিথ্যে কথা বলতে পারে নি। অম্লান বদনে সে স্বীকার করেছে—চেষ্টা করে নিজের জীবিকা অর্জন করতে না পারলে, জেল থেকে বেরিয়ে আবার সে তার পাওনা সমাজের কাছ থেকে কেড়ে নেবে। ভিক্ষা সে করতে পারবে না, কারুর করুণাও তার অসহ্য।

বড় একলা মনে হচ্ছিল শান্তনুর, রাজাগোপালন নেই, অর্দ্ধেন্দু নেই, বনলতা, অতসী, হিউট, ফাদার ইশপ এমন কি শকুন্তলাও নেই।

ইভামাসি কেমন আছেন কে জানে। ইভামাসির কাছে যাবে সে কোন মুখে।

নায়নার খবর সে রাখে না। রাখার প্রয়োজনও নেই। প্রায় বছর খানেক পূর্বে একদিন সে গিয়েছিল নায়নার খবর জানতে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয়। মস্ত পার্টি ছিল সেদিন মিঃ কোহলীর বাড়ীতে। শান্তনু ভিতরে যায় নি। নিমন্ত্রণ তার ছিল না।

দূর থেকে হলেও শান্তনু দেখেছিল—নায়না তখন অতিথিদের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত। পরণে তার গাউন, ববছাঁট চুল, সমস্ত শরীরে কসমেটিকসের প্রলেপ। তিরিশ বছরের নায়নার শরীরে তখন বিশ বছরের যুবতীর কর্ম-তৎপরতা। ড্রিঙ্ক নাচ আর হৈ-হুল্লোড়ে তার কেটেছিল অনেকক্ষণ। ফাদার ঈশপ দিনে দু-ঘণ্টা একা তাঁর ঘরে কাটাতেন। শান্তনু এর করণ জিজ্ঞেস করায়, বলতেন—,

একা না হলে যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করা যায় না শান্তনু।

তিনি যে সব সময় হাত বাড়িয়ে আছেন, সংসারে ব্যস্ত থাকি বলে আমরা সেটা দেখতে পারি না। ছোট ছোট অবলম্বনগুলো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করি। সব চাইতে বড় অবলম্বনটার কথা তখন মনে থাকে না। একা থাকলে সেটা টের পাওয়া যায়।

ফাদারের বিশ্বাস আর ভক্তি দেখে শান্তনু বিস্মিত হত। একটু রাগও হত। অকারণেই সময় নষ্ট করা। কোন কাজ না, শুধু চুপ করে চোখ বুঝে বসে থাকা।

শান্তনুও তো আজ একলা, একেবারে একলা! কৈ সে সেই মস্ত অবলম্বনটার কিছুই টের পাচ্ছে না, তার মনে হচ্ছে সব শূন্য, সব ফাঁকা। একি দুর্বিষহ অবস্থা।

ফাদারকে শান্তনু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা আপনার মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী লোক আর কেউ আছে।

ফাদার ইশপ জোর গলায় বলতেন, আছে শান্তনু, অনেক আছে। তাঁরা না থাকলে যে সংসার অচল হয়ে যাবে। এই প্রয়াগ সঙ্গমেই তাঁদের অনেককে মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

'প্রয়াগ সঙ্গম', শান্তনুর কথাটা মনে পড়তেই সোজা হয়ে উঠে বসে চেয়ারটায়। তাই তো, আজ যে তার ফাদার ইশপকে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে ফাদার ইশপকে। তাঁর নির্দেশ ছাড়া সে যে কিছুই করতে পারবে না। শান্তনু আস্তে অস্তে বেরিয়ে আসে অরফেন হোমের বাইরে।

সেই ছোটবেলায় স্কুলে যাবার পথে ঠিক এই অর্ধবৃত্তাকার গেটটার নিচে শান্তনু নায়নাকে জিজ্ঞেস করেছিল—নায়না, অরফেন মানে কি?

আজও সেই লেখাটা অম্লান রয়েছে—ইশপস্ অরফেন হোম।

আজ নায়নার সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করত—মানুষ কি নিজে থেকেই অনাথ হয়, নাকি মানুষকে অনাথ করা হয়। যারা করে, তারা কারা?

অরফেন হোমের উপর তখন সন্ধ্যার আধো-অন্ধকার নেমে এসেছে। লনের আলোটা সেই অন্ধকার দূর করার ব্যর্থ চেষ্টায় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তনু বেরিয়ে আসে গেটের বাইরে। কিছু এগিয়েও গিয়েছিল।

একটি মোটর এসে থামে গেটের নীচে। একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে গাড়ী থেকে—কোলে তার নবজাত এক শিশু।

শান্তনু—নায়নার আর্ত চিৎকারে শান্তনু থমকে দাঁড়ায়। সেই রাত্রের চেয়ে করুণ এ কণ্ঠস্বর, আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

শান্তনু দৃঢ় হয়, আর দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না।

শান্তনু কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চলে।

শান্তনু ? শোন শান্তনু, তোমায় যে আমার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ?

শান্তনু একটু থেমে দাঁড়ায়। পিছনে না ফিরেই বলে, আমাকে আর কারুর প্রয়োজন নেই নায়না!

নায়না অস্থির হয়ে বলে,

আছে শান্তনু, আমার আছে। একবার একটু শুনে যাও।

শান্তনু অধৈর্য হয়ে বলে,

আমাকে পিছু ডেক না নায়না, আমার আর কাউকে দরকার নেই।

আছে শান্তনু ? নায়না শান্তনুর পিছনে এসে দাঁড়ায়। কারুর জন্য না হোক এর জন্য তোমার দরকার আছে। বল্‌তে বল্‌তে নায়না শান্তনুর হাতে শিশুটিকে তুলে দেয়।

শান্তনু বিস্মিত হয়ে বলে,

এ কে নায়না ? তোমার ছেলে ?

নায়না শান্ত কণ্ঠে বলে—

অনাথ!

অনাথ! কি বলছ নায়না ? বল এ কে ?

নায়না তেমনই শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলে,

বললাম তো অনাথ।

শান্তনু মুখ বিকৃত করে বলে—

আমি কি করব ওকে নিয়ে?

নায়না অবাক হয় শান্তনুর এ ব্যবহারে।

মনে পড়ে তুমিই একদিন বলেছিলে, দে আর মাই ব্রাদার্স এণ্ড সিস্টারস্ নায়না।

শান্তনুও সাথে সাথে বলে—

এখন তা বলি না। এখন দে আর ডার্টি পুওর ফেলোস্।

একি বলছে শান্তনু! তার মাথা খারাপ হল নাকি! নায়নার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কথায় আবেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

সত্যি বলছি শান্তনু, আমার তৃষ্ণা মেটে নি। তুমিই না বলতে ওদের মানুষ না করতে পারলে কোন এ্যাচিভমেণ্ট নেই। শান্তনু আমারও আজ তাই ধারণা। তোমার মত আমিও তৃষ্ণার্ত। আমাকে তোমার সাথে একটু কাজ করতে দাও শান্তনু। আমিও যে আজ অনাথ।

শান্তনু চমকে ওঠে নায়নার কথায়—

অনাথ? মিঃ কোহলীর কি হল?

আমায় ত্যাগ করেছেন।

কেন?

কারণ আমি ক্রিশ্চিয়ান নই। আমিও যে পেরেণ্টলেস্। নায়না? শান্তনু আর স্থির থাকতে পারে না।

নায়নার দুটো হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে,

তুমি এটা মেনে নিলে নায়না। মিঃ এণ্ড মিসেস্ টেলর তোমার পেরেন্টস্, এতবড় মিথ্যার তুমি প্রতিবাদ করলে না। ইউ আর রিয়েলী ফুল্।

নায়না আস্তে আস্তে বলে,

তুমিও তো একদিন এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ কর নি। করলে আজ হয়ত আমার এ দশা হত না। ইভামাসি বলেছেন তুমি জানতে মিঃ এণ্ড মিসেস্ টেলার আমার কেউ নন্।

নায়না আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না—শান্তনু, মনে পড়ে এই অরফেন হোমের নীচে দাঁড়িয়ে একদিন বলেছিল, অরফেন মানে কি? বলেছিলাম যাদের বাবা মা নেই, তারাই অরফেন। সেদিন ভুল বলেছিলাম শান্তনু, প্রত্যেক অরফেনের মা আছে; বাবা নেই। এ তাদেরই একজন। শান্তনু একে তুমি ফিরিয়ে দিও না। নায়না আবার সেই শিশুটিকে শান্তনুর দিকে দুই হাতে ধরে বাড়িয়ে দেয়।

শান্তনু বিস্মিত হয়ে বলে।

এ তোমার আর কোহলীর ছেলে?

নায়নার কান্না তখনও থামেনি—

বললাম তো এর মা আছে, বাবা ছিল একজন, এখন নেই।

শান্তনুরও ধৈর্য্যের বাঁধ তখন ভেঙে গেছে,

বল নায়না এর বাবা কে?

মিঃ মেহটা?

নায়না?

সত্য এমনই কঠিন শান্তনু? একে তুমি নাও, ফিরিয়ে দিও না। এও যে অরফেন।

শান্তনুর হঠাৎ কি হল বোঝা যায় না। তার মুখ গম্ভীর হয়। হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়।

শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে—

নায়না সত্য শুধু কঠিনই নয়, সত্য সুন্দরও। কারুর মাথায় আর আমি অনাথের অপবাদ রাখতে চাই না নায়না। আজ থেকে এরও সেই অপবাদ ঘুচল। একে আমি গ্রহণ করলাম। তোমায় কথা দিলাম নায়না, বড় হয়ে—এ পিতৃ-পরিচয় পাবে।

শান্তনু, শান্তনু—তুমি সত্যি বলছ? নায়নার চোখে এবার আনন্দাশ্রু। শান্তনুর কোলে মাথা।

বললাম তো নায়না, সত্য শুধু কঠিনই নয় সুন্দরও।

এবার নায়নার হাত ধরে বলে, চলো নায়না, অরফেন হোমের ছেলেমেয়েরা যে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। তারা সবাই যে তৃষ্ণার্ত। তুমি শুধু এরই মা নও, তাদের সকলের।

নায়না আনন্দে কথা বলতে পারে না। অরফেন হোমের অর্দ্ধবৃত্তাকার সেই সাইন বোর্ডের নীচ দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলে—

সত্যি শান্তনু, এ ক্রিশ্চিয়ান ইজ নেভার গ্রেটার দ্যান এ হিন্দু।

শান্তনু বাধা দেয়,

না, না। ও কথা বোল না নায়না

নান্ ইজ গ্রেটার দ্যান এ ম্যান।

ইশপস্ অরফেন হোমে তখন ইভিনিং প্রেয়ার সবে শুরু হয়েছে।

সমাপ্ত